বিপজ্জনক আরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারবার

ঘটাদার বলা গল্পগুলো যারা ভালোবেসে পড়েছেন, তাদের কিছু বলার নেই। আসলে ঘটাদার গল্প—বিশ্বাস, অবিশ্বাস ও অন্ধবিশ্বাস, তথাকথিত বিজ্ঞানের কচকচি, দর্শনের ঠুলি, কিছুই মানে না। শুধু মানে লজিক এবং উন্নতমানের কল্পনা। যারা এ দুটোয় পিছিয়ে থাকতে ভালোবাসেন, তারা ঘটাদার গল্প শুনবেন না বা পড়বেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসার নানান রূপ
এ পরীক্ষা সে পরীক্ষা
শাসন বারণ দীর্ঘ চুপ।
একটা জীবন যথেষ্ট নয়
নেই প্রয়োজন থামার
এই জীবনটা নয় ছয়ে গেল
পরের জন্মে আমার।

স্থান অন্ধকার রক। **পাত্র** চারজন। আমি, অনিন্দ্য, রাজা ও চন্দন। পরিবেশটা বেশ ধোঁয়াটে। দূরের ল্যাম্পপোস্টগুলো প্রেতের মতো মাথা নুইয়ে রাস্তাটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। মনে হচ্ছে, এক সময় খেয়ে নেবে।

আড্ডা মারার আদর্শ পরিবেশ। কিন্তু আড্ডা মারা যাচ্ছে না। কেউ কারুর কথা শুনতে পাচ্ছি না। কারণ শব্দদূষণ। আমাদের পাড়ার বাজার কমিটি একটা হরিসংকীর্তন আয়োজন করেছে। চব্বিশঘণ্টাব্যাপী। দুপুর থেকে শুরু হয়েছে। পাড়ার কেউই আর কথা বলছে না। সবাই যোগেশ মাইমের স্টুডেন্ট হয়ে গেছে।

কথায় আছে 'সমঝনেওয়ালো কে লিয়ে ইশারাহি কাফি।' এই কথার মর্মান্তিক সত্য আজ আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। দুপুর থেকে 'হরি হরি' রবে পাড়া গমগম করছে। দুপুরে বিষয়টা ছিল সমবেত হরি নাম। তাতে কোনো স্কেল বাধ্যতামূলক নয়। যে যেমন স্কেলে পারে গাইছে। খানিক গো অ্যাজ ইউ লাইক-এর মতো, বা বসে আঁকোর মতো। যে যা পারো গাও।

তা গাইতে পারে মানুষ। এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু যারা শুনছে বা শুনতে বাধ্য হচ্ছে তারা যে কতটা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করছে, তাতে আমাদের সন্দেহ আছে। কারণ কানের পরদা গণতন্ত্র বোঝে না। আমাদের কানের পরদার সঙ্গে ধৈর্যের বাঁধও ভেঙে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা চিৎকার করে বলে, 'যত সব আতাক্যালানে। না আছে সুর, না আছে তাল। ষাঁড়ের মতো চিৎকার করেই চলেছে।'

চন্দন বলে, 'এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্কই নেই। এটা হল একদল বুড়োবুড়ির গেট টুগেদার, পিকনিক টাইপের।'

এবার দেখলাম 'হরি হরি' সমবেত সুর থেমে, একক গলায় একজন মহিলা কথকের মতো কী গাইছে। তার বলা বা গাওয়ার মাঝে মাঝে কোরাস 'হরি হরি' ভেসে আসছে।

আমাদের সন্ধেটাই মাটি হয়ে গেল। উঠতে যাব ভাবছি, এমন সময় অন্ধকার পার্কের মধ্যে দিয়ে ছায়ার মতো একজনের আবির্ভাব হল।

ঘটাদা।

ঘটাদা সম্পর্কে এককথায় কিছু বলা সম্ভব নয়। কেউ বলে ঘটাদা জ্ঞানী, কেউ বলে মহামূর্খ, কেউ বলে দার্শনিক, কেউ বলে ভাট। সেই ঘটাদাই অন্ধকার ঠেলে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'কী ব্যাপার, আজ আড্ডা মনে হয় জমছে না।'

চন্দন বলে, 'কী করে জমবে? এই অর্থহীন উৎকট চিৎকার চললে?'

ঘটাদা ঘাসের মধ্যে গ্যাঁট হয়ে বসতে বসতে বললেন, 'অর্থহীন?'

রাজা বলে, 'অর্থহীন নয়তো কী? একপাল ফ্যানাটিক চিৎকার করেই চলেছে। না তাল, না সুর।'

ঘটাদা আমাদের থেকে একটা সিগারেট চেয়ে সেটা ধরায়। ঠিক তক্ষুনি হরিসংকীর্তন উগরে দিচ্ছিল যে-মাইকটা, সেটা হঠাৎ-ই ঘড়ঘড় শব্দ করতে করতে বন্ধ হয়ে গেল। মনে হয় কোনো টেকনিক্যাল ফল্ট। গোটা পাড়া, অন্ধকার মাঠ, আমাদের রক জুড়ে নেমে এল আকাশ প্রমাণ নৈঃশব্দ। আমরা কেমন দিশেহারা হয়ে গেলাম।

ঘটাদাই নৈঃশব্দ ভাঙল ঃ 'আয় তোদের একটা গল্প শোনাই।'

তখন আমার উঠতি বয়স। ভালো চাকরিবাকরি জোটেনি। একটা পাতি ওষুধ কোম্পানির হয়ে আমি তখন দাদ, হাজা, চুলকানির ওষুধ বেচি। বড় বড় শহরে আমাদের ওষুধ বিক্রি হয় না। তাই গ্রাম-গঞ্জেই আমায় ওষুধ বেচতে হয়। আমার তখন ভবঘুরে জীবন। আজ এ-গ্রাম কাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও-গ্রাম। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম একটা জায়গায়। জায়গাটা মূলত ভেড়ি অঞ্চল। স্থলের চেয়ে জলই বেশি।

ভেড়িগুলোতে মূলত মাছ চাষই হয়। আমদানিও প্রচুর। সেক্ষেত্রে দেখতে গেলে গ্রামটি সচ্ছলই বলা চলে। গ্রামের লোক একটি সমবায় করে ভেড়িগুলো চালায়। ভেড়ির কোনো একক মালিক নেই বললেই চলে। অঞ্চলটি বিশাল বড়। একটি স্টেশন—মানে একটি রেলস্টেশন। স্টেশনের নাম বেন্দাই। প্ল্যাটফর্মের বালাই নেই। মোরামের বিছানো পথের মতো। একটাই বসার বেঞ্চ। সেটি অবশ্য লোহার।

স্টেশনে স্টেশনমাস্টার বা গার্ডের একটা গুমটি আছে। সেখানে গার্ড পাকাপাকিভাবে বাসও করে। সারাদিনে চার-পাঁচটা ট্রেন ছাড়া আর কোনো ট্রেন এই রুটে চলেও না। তাই গরু, ছাগল বিনা দ্বিধায় রেললাইনে উঠে লাইন সংলগ্ন ঘাস খায়। তবে হ্যাঁ, রাজধানী যাওয়ার একটি ট্রেন সকাল দশটায় একবার পনেরো সেকেন্ডের জন্য, আর রাজধানী থেকে ফেরার সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় একবার পনেরো সেকেন্ডের জন্য দাঁড়ায়। কারণ, এই গ্রামে একটি জাগ্রত কালীমন্দির আছে। ট্রেন ড্রাইভাররা সংস্কারবশত এখানে দাঁড়িয়ে আসছে বহুদিন ধরে। রেলের টাইম টেবিলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে।

পুরো গ্রামটা তদারক করে, থাকার কোনো জায়গা জোগাড় করতে পারলাম না। এ গ্রামে যে ব্যবসা হবে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু থাকব কোথায় ভাবতে ভাবতে স্টেশনে ফিরে এসে গার্ডের গুমটিটা দেখে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেলাম গার্ডের ঘরে। দেখলাম, গার্ডবাবু জামাকাপড় ছেড়ে একটা লুঙ্গি পরে খালি গায়ে তক্তপোশে বসে এক থালা মুড়ি খাচ্ছে। আমি আমার পরিচয় দিলাম। লোকটা বেশ আমুদে। বসতে বলে বললেন, 'মুড়ি খাবেন নাকি।'

আমি বললাম, 'এই ভর সন্ধ্যায় শুধু মুড়ি?' লোকটার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'তা ছাড়া আমার তো আর কিছু নেই।'

এবার আমি আমার ব্যাগ থেকে রামের একটা আস্ত বোতল বার করে বললাম, 'আমার আছে।'

লোকটা হো হো করে হেসে উঠল। অর্থাৎ, সম্মতির লক্ষণ। ব্যাস, থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। আর থাকা মানে তো রাতটুকু। বাকি সময় তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওষুধ ঘাড়ে টো টো কোম্পানি।

পরের দিন সকালে বেরিয়ে পড়েছি। বের হওয়ার আগে দেখেছি, খাটের নীচে লক্ষ্মণের বড় ভাই বোতলে অর্ধেকের মতো বিরাজমান। তার মানে আজ রাতটাও নিশ্চিন্ত। বিপদ হবে কাল। সে দেখা যাবে। আমি ব্যাগ নিয়ে গ্রামের উদ্দেশে পা বাড়ালাম।

সেদিন কাজ হয়ে যাওয়ার ফলে একটু তাড়াতাড়ি স্টেশনে ফিরে এলাম। তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। গার্ড তারকবাবুর ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে দেখলাম স্টেশন চত্বরের লোহার বেঞ্চটায় নীল রঙের শাড়ি পরা একজন মহিলা বসে আছে। অপূর্ব সুন্দরী, গায়ের রং ফেটে পড়ছে। মাথার চুলে পাক ধরেছে। শরীরে কোনো গয়না নেই। দুচোখে এক অদ্ভুত ধরনের উদাস দৃষ্টি। মনে হয়, চোখ নয়, যেন গাংচিলের দুটো ডানা।

একটু অবাকই হলাম। এই গণ্ডগ্রামে এইরকম একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা কী করছে? ভাবতে ভাবতে তারকবাবুর ঘরে ঢুকে পড়লাম। দেখি তারকবাবু রান্না করছেন।

আমায় দেখে একগাল হেসে বললেন, 'ভায়া, আপনার জন্যে একটু কচ্ছপের মাংস রান্না বসিয়েছি।'

আমি ইতস্তত করে বলি, 'এর কি কোনো দরকার ছিল? আশ্রয় দিয়েছেন, সেটাই কত বড় ব্যাপার...।'

তারকবাবু বললেন, 'অতিথি দেবো ভব', তারপর হো হো করে হেসে ওঠেন।

আমি বলি, 'আমি বরং জামাকাপড় ছেড়ে, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দিই। তারপর কচ্ছপ সহযোগে লক্ষ্মণের বড় ভাইকে এক হাত দেখে নিতে বসব।'

তারকবাবু উৎসাহে লাফাতে থাকেন, 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ।'

পরের দিন ভোর হতে বেরিয়ে পড়লাম গঞ্জের দিকে। সেখানে একটা হাট বসে। ফেরিওয়ালাদের এত বাছবিচার করলে চলে না। হাটে-মাঠে-ঘাটে যেখানে সম্ভব সেখানেই মাল বেচতে হয়।

সেদিন ভালোই মাল বিক্রি হল। খুশি মনে একটা মুরগি আর লক্ষ্মণের ভাইকে নিয়ে স্টেশনে ফিরলাম। দেখলাম, তারকবাবু নেই। তখন চারটে মতো বাজে। ভাবলাম, বোধহয় গ্রামের দিকে গেছেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু কিনতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে সন্ধের পর শ্মশানের নিস্তব্ধতা নেমে যায়। তারকবাবুর ঘরের দরজার সামনে একটা উঁচু ঢিবি মতো আছে। তাতে ঘাসও আছে। ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল তারকবাবুর ডাকে, 'ও মশাই, আপনি তো আমার অকল্যাণ না করে ছাড়বেন না দেখছি। গৃহস্থের দোরগোড়ায় এমনভাবে শুয়ে আছেন? কী লজ্জা, কী লজ্জা!'

আমি ধড়মড় করে উঠে বসি, বলি, 'একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আপনি ছিলেন না, তাই আর ভেতরে ঢুকিনি।'

তখনই তারকবাবু একহাত জিভ বার করে বলেন, 'কী আশ্চর্য! আমি নেই বলে আপনি রাস্তায় শোবেন? আমায় কি আপনার এত বড় পাষণ্ড মনে হয়?'

তারকবাবুর সঙ্গে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি স্টেশনের অন্যপ্রান্তে বেঞ্চটাতে সেই মহিলাটি বসে আছেন। আজও তার পরনে নীল রঙের শাড়ি, আজও তার চোখে আকাশের বিষণ্ণতা।

আজ আর সময় নষ্ট না করেই ঘরে ঢুকে তারকবাবুকে প্রশ্ন করলাম, 'মশাই, এ মহিলা কে? উনি কি রোজ এসময় এখানে আসেন?'

তারকবাবু বিছানা ঠিক করতে করতে বললেন, 'আবার চলেও যান।'

আমি বললাম, 'কিন্তু এই সময়ই কেন?'

তারকবাবু বলেন, 'কারণ দিল্লি থেকে ফেরার ট্রেনটা এই সময়ই এখানে পনেরো সেকেন্ডের জন্যে দাঁড়ায়।'

আমি বলি, 'তাতে ওনার কী? উনি তো ট্রেনটার যাত্রী হতে চান না।'

তারকবাবু বলেন, 'না যাত্রী হতে যাবেন কেন? মাইলখানেক হেঁটে উনি রোজ এই সময় সেজে গুজে আসেন যাত্রী হবেন বলে? মনে হয় আপনার?'

আমি একটু অবাক হয়ে বলি, 'রোজ আসেন?'

তারকবাবু স্টোভ ধরাতে ধরাতে বলেন, 'হ্যাঁ, রোজ আসেন। ঝড় হোক, বাদল হোক, যাই হোক রোজ এই সময়। গত বাইশ বছর ধরে।'

আমি বলি, 'বলেন কী! বাইশ বছর ধরে! কেন? কেন আসেন?'

তারকবাবু একটু হেসে বলেন, 'সে মস্ত গল্প। সন্ধেবেলা না হয় বলব।'

আমি অস্থির হয়ে বলি, 'ওনার নাম কী? এখানে কোথায় থাকেন? কী করেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারকবাবু বলেন, 'ওনার নাম অনুরাধা ঘোষ। থাকেন এই অঞ্চলেই। একটা স্কুলে পড়ান। এইটুকুই আপাতত জানুন। বাকিটা সন্ধের হাতে ছেড়ে দিন।'

এমন সময় শব্দ করে দিল্লি ফেরত ট্রেনটা স্টেশনে এসে দাঁড়ায়। পনেরো সেকেন্ড পরে আবার চলেও যায়।

তারকবাবু তখন শতরঞ্জিটা ঝাড়ছেন। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে বেঞ্চের দিকে তাকালাম। দেখলাম বেঞ্চটা খালি। মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম, স্টেশনের বাইরে ধু-ধু মাঠটার ওপর দিয়ে একটা চলমান নীল কিছু ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে দূরে গ্রামের দিকে।

'পঁচিশ বছর আগে এ অঞ্চলটা এরকম ছিল না। আরও গ্রাম্য ছিল। আরও বন্য ছিল। এ অঞ্চলটা ছিল ত্রাস। আপনি হয়তো বলবেন, আমি জানলাম কী করে। পঁচিশ বছর আগে তো আমি এখানে ছিলাম না। আমি তো এসেছি বছরপাঁচেক। আমি জেনেছি, আগের গার্ডবাবুর কাছ থেকে। তিনিও জেনেছেন আগের গার্ডবাবুর কাছ থেকে। তিনিও তার আগের... আসলে আপনার মতো আমাদের সবারই একই প্রশ্ন জেগেছিল, কে এই মহিলা? কেনই বা রোজ আসেন?

এ গল্প বেন্দাই গ্রামের এবং আশেপাশের সবাই জানে। কিন্তু কেউ মুখ খুলতে চায় না—অপরিচিত লোকের কাছে। এ গল্প ওদের কাছে ভালোবাসা আর গোপনীয়তার প্রতি এক ধরনের সম্মান দেখানো।'

সন্ধে হয়ে গেছে। আমরা শতরঞ্জিতে বসে। ঘরে একটা ঝুলপড়া বাল্‌ব জ্বলছে—যার আলো অন্ধকারকেই প্রকট করছে। আমরা এখন জলপথে। চোখে একটু ঘোর লেগেছে।

আমি এবার একটু অস্থিরভাবেই বলি, 'মশাই, এবার শুরু করুন...আমি তো আর পারছি না।'

তারকবাবু হেসে ফেলেন আমার অস্থিরতা দেখে। শুরু করলেন অবশেষে।

এখানে গল্পের অনেকগুলো চরিত্র...কাকে দিয়ে শুরু করি। বেশ, ত্রাস দিয়েই শুরু করি। এমার্জেন্সির সময় থেকেই হুলিগানরা রাজনীতির একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় স্তম্ভ হয়ে উঠেছিল। সরকার বা বিরোধী সবাই তখন হুলিগানদের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে একই ভাবনা পোষণ করতে শুরু করেছে। কিন্তু বিরোধী শাক্তির সেই অর্থে হুলিগান শক্তি কম। সবাই চাষা, মজুর আর কিছু বুদ্ধিজীবী। এইরকম এক বুদ্ধিজীবীকে দায়িত্ব দেওয়া হল অ্যাকশন বা সুইসাইড স্কোয়াড বানানোর। যারা সরকারি শক্তির জুলুমের বিরুদ্ধে শক্ত হাতে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। সোজা কথা, মারের বদলে মারবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সেই বুদ্ধিজীবীর নাম সাজিদ মাস্টার। উনি এই অঞ্চলের এক স্কুলের মাস্টার। তার নেতৃত্বে গড়ে উঠল এক বিরাট বাহিনী—যারা মাস্টারের কথায় মরতে এবং মারতে রাজি। অবশ্যই রাজনৈতিক ঝান্ডাকে সামনে রেখে।

অনেক লড়াই, অনেক প্রতিরোধের পর সরকার বদলাল। গোটা রাজ্য লাল হয়ে গেল। সবাই ভাবল নতুন সূর্য উঠেছে। এবার আর সমস্যা থাকবে না। সবাই এক। কিন্তু বিরোধী হয়ে যে কথা বলা যায়, সরকারে বসে তো আর সে কাজ করা যায় না। আসলে শাসন যন্ত্রটাই আখ পেষাই যন্ত্রের মতো। চালাতে গেলে পিষতেই হবে। জ্বলন্ত প্রমাণ মরিচঝাঁপি।

মরিচঝাঁপির ঘটনায় সাজিদ মাস্টার চমকে গিয়েছিলেন, ভেঙে পড়েছিলেন। কারণ, তাঁর বাহিনীর এক অংশের সাহায্য নিয়েই মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু নিধন হয়েছিল। তিনি পার্টির নেতাদের কাছে দরবার করলেন। জানালেন, পার্টিজান আর লেঠেল এক নয়। উনি লেঠেল বা ঠ্যাঙারে সাপ্লায়ার নন।

নেতারা হেসে বললেন, 'পার্টিজান আর লেঠেলদের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। পার্টিজানরাই পার্টি লেঠেল।'

সাজিদ মাস্টারের মন ভেঙে গেল। তার রাজনৈতিক সক্রিয়তা কমতে লাগল। তিনি শুধুই স্কুলে পড়াতে লাগলেন।

পার্টির নেতারা দেখল বিপদ। সাজিদ মাস্টার বসে গেলে তাঁর এই বিশাল বাহিনী বসে যাবে। সুতরাং আর-একটা সাজিদ মাস্টার দরকার। যার রাজনৈতিক জ্ঞানের খুব একটা দরকার নেই। শুধু ত্রাস তৈরির ক্ষমতা থাকলেই হবে। কারণ ত্রাস ছাড়া সরকার চলে না।

ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে গেল। উঠে এল একজন, কলিমুদ্দিন শামস্। সাজিদ মাস্টারেরই এক শিষ্য। হিংস্র এবং নিষ্ঠুর। পার্টির নেতাদের এমনই একজন লোককে দরকার ছিল, যার মধ্যে প্রশ্ন বা দ্বিধা থাকবে না। যে শুধু হুকুম তামিল করবে। বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেল। সাজিদ মাস্টার ইতিহাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে গেলেন।

একদিন সাজিদ মাস্টার স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছেন সাইকেলে চেপে। বাজারের চার মাথায় লাল ফ্ল্যাগে ভরপুর। বোধ হয় পার্টির কোনো সভা হবে। একটা মঞ্চও বানানো হয়েছে। কলকাতা থেকে নেতারা আসবেন। মাস্টারের মুখে একটা বিদ্রুপের হাসি খেলে গেল। তখন দেখলেন, কলিমর ছেলেরা একটা বারো-তেরো বছরের ছেলেকে ধরে মারছে। ছেলেটার ঠোঁটের কষ দিয়ে রক্ত পড়ছে।

সাজিদ মাস্টার সাইকেল থামান। হাঁক দেন, 'নেপাল, কী করিস? থাম।'

সিংহ অবসর নিলেও সিংহই থাকে। থমকে যায় ঠ্যাঙাড়েবাহিনী। এদের অধিকাংশই মাস্টারের হাতেই তৈরি।

নেপাল এগিয়ে যায় মাস্টারের দিকে।

'মারিস কেন?'

নেপাল ঘটনাটা বলে। পার্টির সভা হবে সন্ধেবেলা, তাই মাইক টেস্ট হচ্ছিল। হঠাৎ-ই এ ছোকরা জনহীন মঞ্চের পাশে খোলা মাইক পেয়ে হাবিজাবি গান গাইতে শুরু করে দেয়। তাই তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এ প্রহার।

সাজিদ মাস্টার ছেলেটার দিকে তাকান। সারা গায়ে ধুলো, রক্তাক্ত মুখ, গায়ে কালসিটে, গায়ের রং কালো, মাথা ভরতি ঝাঁকড়া চুল। চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ছে না। সে চোখে আত্মবিশ্বাস। কৃতকর্মের জন্য কোনো অনুশোচনা নেই। সে চোখে খানিকটা বিদ্রুপও আছে। সাজিদ মাস্টার নেপালকে বলেন ছেলেটাকে ছেড়ে দিতে। নেপালরা চলে যায়।

সাজিদ মাস্টার ছেলেটাকে বলেন, 'চল আমার সঙ্গে।'

সাজিদ মাস্টার সাইকেল হাঁটিয়ে চলতে থাকে, পাশে পাশে ছেলেটাও চলে। এবার সাজিদ মাস্টার ছেলেটাকে চিনতে পারেন। এ ছেলেটা চার্চে থাকে। ছেলেটি অনাথ। চার্চের ফাদারই একে বড় করেছে।

মাস্টার জিগ্যেস করেন, 'তোর নাম কী?'

ছেলেটি ধরা গলায় বলে, 'মিডাস ফার্নান্ডেস।'

এ ছেলেটি এ গ্রামের ছেলেদের সঙ্গেই খেলাধুলো করে।

মাস্টার বলে, 'এত বড় নাম?'

ছেলেটি হেসে ফেলে বলে, 'গ্রামে সবাই আমায় মাধো বলে ডাকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস্টার বলেন, 'পড়াশুনো করিস না?'

ছেলেটি বলে, 'আজ্ঞে ক্লাস এইট। মিশনারি স্কুলেই পড়ি।'

মাস্টার বলে, 'মিডাস কে জানিস?'

ছেলেটি বলে, 'যার ছোঁয়ায় সব সোনা হয়ে যায়।'

মাস্টার খুশি হন। এবার একটা ফাঁকা মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, 'এবার বল তো কী গাইছিলি।'

ছেলেটার চোখ চকচক করে ওঠে। দৃপ্ত গলায় গেয়ে ওঠে—

'রাজা আসে রাজা যায়
সিংহাসন একই থাকে
তুমি আমি উজবুক
ভরি ভোট সিন্দুক
রাজা বানাই যাকে তাকে—
রাজার জন্ম হয় তাদেরই কারখানায়
পুঁজির বিকাশ যারা আঁকে
যাকে রাজা ভাবি ভাই
সে শালা পুঁজির সেপাই
রাজা না, দালাল বলে তাকে।'

সাজিদ মাস্টার অবাক হয়ে বলে, 'এ গান কে লিখেছে?'

ছেলেটা উজ্জ্বল হাসি হেসে বলে, 'টোটোনদা।'

মাস্টার বলে, 'কে টোটোনদা?'

ছেলেটা বলে, 'আমাদের কাকা কলকাতায় বেলগাছিয়ায় থাকে। সে পাড়ারই ছেলে টোটোনদা। আমি যখন কলকাতা যাই, তখন টোটোনদার সঙ্গেই ঘুরে বেড়াই। টোটোনদাও রাজনীতি করে। ছাত্র রাজনীতি। কিন্তু অন্যরকম।'

মাস্টার বলেন, 'গানটার মানে বুঝিস?'

ছেলেটা লাজুক হাসি হেসে বলে, 'বুঝি, তবে সবটা বুঝি না। টোটোনদা বুঝিয়েছে, কিন্তু সবটা বুঝতে পারিনি। স্যার, আপনি বোঝাবেন?'

কী কারণে সাজিদ মাস্টারের চোখে জল এসে গেল। খুশিতে হাসতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগলেন নিঃশব্দে। ভাবলেন, এখন তো আর পলিটিক্যাল ক্লাস হয় না। একজন ছাত্র তো পাওয়া গেল। মাস্টার ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'এবার বাড়ি যা। পরে কথা হবে।'

ছেলেটা ছিলে ছেঁড়া তিরের মতো মাঠ ফুঁড়ে দৌড়োতে শুরু করল। সাজিদ ওকে বিন্দু হতে দেখলেন। তারপর সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিলেন।

এরপর থেকে শুরু হয়ে গেল গুরু-শিষ্যের পাঠশালা। দিন যায়। ফরাসি বিপ্লবের ধূসর পাতা অতিক্রম করে চে গুয়েভারার ডায়েরি থেকে কাকদ্বীপ কৃষক আন্দোলন হয়ে নকশালবাড়ি পথ অবধি...। ছেলেটা, মানে মাধো, অবাক বিস্ময়ে শোনে। সাজিদ মাস্টার বলে যায়।

বেশ যাচ্ছিল দিনগুলো। একদিন ঘটনাটা ঘটল। মাধো তখন স্কুল পাশ করে গেছে। মাস্টার খুব খুশি। সবাইকে বলেন, মাধো সব বিষয়েই আলাদা। দুষ্টুমিতেও আবার পড়াশুনোতেও। মাধোর বন্ধুরাও খুশি। তারাও সংখ্যায় কম নয়! একটা বিশাল দল। তারা একদিন মাস্টারকে ঘিরে ধরে, 'স্যার, আপনার ছাত্র পাশ করেছে, আপনাকে খাওয়াতে হবে।'

মাস্টার খুশি মনে বলে, 'বেশ, সামনের রবিবার।'

সবাই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে চলে যায়।

মাধো মাস্টারকে বলে, 'কথা তো দিয়েছেন। খাওয়াবেন কী? পয়সা কোথায়?'

মাস্টার বলেন, 'আমি যা খাই, তাই খাবে। চিন্তা করিস না।'

মাধো বলে, 'আপনি বলুন। আমি বললে, ওরা আর এরকম অন্যায় আবদার আর করবে না।'

মাস্টার জানেন, মাধো সে ক্ষমতা রাখে। ওর দল ওর কথায় ওঠে বসে। ওকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে ওর বন্ধুরা। ওর মধ্যে একটা জন্মগত নেতাসুলভ ব্যাপার আছে। সবাই ভালোবেসেই ওর নেতৃত্ব মেনে নেয়, ভয়ে নয়।

মাস্টার বলেন, 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখ। আমি সব সামলে নেব।'

কিন্তু সামলানো হল না। দিনতিনেক পর, একদল লোক মুখ গামছা দিয়ে ঢেকে বাইকে করে এসে সাজিদ মাস্টারকে গুলি করে চলে গেল। মাস্টার তখন নির্জন পথ দিয়ে সাইকেলে করে ফিরছিলেন স্কুল থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধো যখন খবর পেয়ে দৌড়ে পৌঁছোল তখন মাস্টার মাঠের ধারে পড়ে রক্তাক্ত শরীরে ধুলো মাখা অবস্থায়।

অসহায় মাধোর চোখের জল দেখে মাস্টার একটু হাসার চেষ্টা করেন। মাধোকে কাছে ডেকে কানের কাছে মুখ নিয়ে বিড়বিড় করে কিছু বলে মারা যান।

সব জায়গায় রাষ্ট্র হয়ে গেল, কারা হত্যাকারী। সে কথা মাস্টার মাধোকে বলে গেছেন। যদিও সবাই জানে, এ কাজ কাদের বা কার নির্দেশে হয়েছে। কিন্তু মাস্টারের ডায়িং স্টেটমেন্ট একমাত্র মাধোর কাছেই আছে। এ কথা লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। ফলে চার্চের ফাদার মাধোকে নিরাপত্তার কারণে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। এখানে থাকলে মাধো খুন হয়ে যেতে পারে—সেই ভয়ে।

মাধো যখন একটা টিনের বাক্স নিয়ে কলকাতার বাসে উঠছে, তখনো কেউ জানে না মরার আগে মাস্টার মাধোর কানে কানে কী বলে গেছেন। মাধো কাউকে তা বলেনি। মাস্টার মারা যাওয়ার আগে হত্যাকারীদের নাম বলেননি। তার চেয়েও সাংঘাতিক কথা বলে গেছিলেন মাধোকে। যার ফলে কয়েক বছর পরে ভেড়ি অঞ্চলে আগুন জ্বলে উঠেছিল।

বহুমানুষের রক্তে লেখা হয়েছিল এক অন্য ইতিহাস। মাস্টার মাধোর কানে কানে মারা যাওয়ার আগে বলেছিলেন, 'ইফ উইন্টার কাম্‌স, ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড?'

দু-চোখে দেখতে পারত না সে সাজিদ মাস্টারকে। সে মানে কলিমুদ্দিন শাম্‌স। সাজিদ মাস্টার সবার সামনে বলতেন, 'ওরে কালি, তোর মধ্যে একটা লুম্পেন এলিমেন্ট আছে। তোর পার্টিজান হয়ে ওঠা বড়ই দুষ্কর।' সব সময়ই কালিকে কোনো কাজ দিলেই অন্য কাউকে ওকে মনিটরিং করার জন্য রেখে দিতেন। অর্থাৎ, পূর্ণ ভরসা করতেন না।

আজ সেসব কথা ভাবতে ভাবতে কালি একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। এখন সে তার নিজের এক খামারবাড়িতে বসেছিল—তার অনুচরবর্গ নিয়ে। অ্যাকাউন্ট্যান্ট ঘোষবাবু তাকে কী একটা হিসেব বুঝিয়েই চলেছেন, কিন্তু কালি কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। তার মন এখন মাস্টারের স্মৃতিতে আচ্ছন্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার একটা সংঘর্ষে তার পা ভেঙে গিয়েছিল এবং পিঠে গুলি লেগেছিল। হাসপাতালে যাওয়ার উপায় ছিল না। কারণ তারা পলাতক। হাসপাতালে গেলেই অ্যারেস্ট হয়ে যাবে। সাজিদ মাস্টার নিজে হাতে তার ক্ষত পরিষ্কার করে দিতেন। কাঠের পট্টি দিয়ে পা বেঁধে দিয়েছিলেন। প্লাস্টারের মতো। যাতে ভাঙা পা তাড়াতাড়ি জুড়ে যায়।

কালির মনে পড়ে যাচ্ছে সেইসব দিনগুলো। কারণ, আজ সাজিদ মাস্টারের তৃতীয় বছরের মৃত্যুবার্ষিকী। সেই উপলক্ষে মাইকে গান বাজছে। সন্ধ্যায় একটা স্মরণসভাও বোধহয় হবে।

কালির এক অনুচর চরণ বলে, 'কালিভাই, আজকের সভাটা পণ্ড করে দেব?'

কালি চুপ করে থাকে। অ্যাকাউন্ট্যান্ট ঘোষবাবু খেঁকিয়ে ওঠেন, 'যত সব গুখোরের দল! মাথায় যদি একটু বুদ্ধি থাকে। একটা মরা মানুষ জ্যান্ত মানুষের চেয়েও ভয়ংকর। বুঝিস সেটা?'

কালি এবার ঘোষবাবুর দিকে তাকায়। ঘোষবাবু বলেন, 'কালি, মানুষ যদি সভা করে ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তাতে আমাদের অসুবিধে কোথায়? কাল সকালেই সব ভুলে যাবে। বিপদ বাধবে যদি আমরা বাধা দিই। মানুষের মনে অন্য বিদ্বেষ জন্মাবে। আর সে বিদ্বেষের নেতৃত্ব দেবে মরা মাস্টার। সেটা কি ভালো হবে?'

কালি চুপ করে শোনে। এসব কথা সে ভালো করে বোঝে না। তবে ঘোষবাবুর কথায় কোনো একটা যুক্তি আছে, সেটা বুঝতে পারে। অনুচরদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'না, তোরা কেউ ও-মুখো হবি না। ঘোষবাবু ঠিক বলেছেন।'

অনুচররা ঘর ছেড়ে চলে যায়। এবার কালি বলে, 'ঘোষবাবু, শুনলাম ছোকরা ফিরে এসেছে।'

ঘোষবাবুর মুখটা একটু মেয়েলি মেয়েলি। কথাটা শুনে শক্ত হয়ে যান। অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে যান। কালির খামারবাড়ির দালানে তখন সূর্য গড়াগড়ি দিচ্ছে। দূরে একটা ঘুঘু পাখির ডাক দুপুরের নৈঃশব্দ বাড়াচ্ছে।

ঘোষবাবু চুপ করে থাকেন।

কালিই আবার বলে, 'কেসটা আবার নতুন করে রি-ওপেন হবে না তো?'

এবার ঘোষ বিরক্ত হয়ে বলেন, 'তিনবছর পার হয়ে গেছে। মাস্টার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্ডার কেস ক্লোজ্‌ড হয়ে গেছে। আমি নিজে হাতে সে ফাইল জ্বালিয়ে দিয়েছি। জেলার, এস পি আমাদের লোক, ডি এম আমাদের লোক, পুলিশ আমাদের। আর এখন একটা ছোঁড়া কিছু বললে কী যায় আসে? কে শুনবে ওর কথা?'

কালি বলে, 'তবে ফিরে এল কেন?'

ঘোষ এবার ইতস্তত করেন, 'এমনিই এসেছে, যাবে কোন চুলোয়! তিন কুলে কেউ তো নেই!'

কালি বলে, 'এসেই মাস্টারের নামে শহিদ বেদি বানানোর জন্যে দল পাকাচ্ছে। তাও এমনি? ভেড়ি বাঁচাও কমিটি বলে একটা কমিটি তৈরি করার চেষ্টা করছে। আমার হাত থেকে ভেড়িগুলো কেড়ে নেওয়ার জন্যে লোক খ্যাপাচ্ছে। আমাদের পার্টির কিছু সমর্থক ওকে সমর্থন করছে ভেতরে ভেতরে। আমার কাছে কিন্তু সব খবর আছে। যদি কিছু হয় আমি কিন্তু কাউকে ছেড়ে কথা বলব না। এটা জেনে রাখবেন, ঘোষবাবু।'

ঘোষবাবু অন্যমনস্ক হয়ে কালির কথায় মাথা নেড়ে সায় দেন।

গত একবছরে গ্রামে এক নতুন পাগল এসেছে। কোথা থেকে এসেছে তা কেউ জানে না। তবে কথা শুনে মনে হয় বাংলার রাঢ় অঞ্চলের বাসিন্দা। পুরোনো মন্দিরের দালানে শোয়, খিদে পেলে গৃহস্থের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যায়। খাবার চায়। কেউ দিলে ভালো, না দিলে পরনের কাপড়টা খুলে ফেলে। বাধ্য হয়ে সবাই খাবার দিয়ে দেয়।

নির্ঝঞ্ঝাট লোক। কাউকে বিরক্ত করে না। শুধু মাঝে মাঝে ভবিষ্যদ্বাণী করে। যার একটাও মেলে না। যেমন, একদিন চিৎকার করে ঘোষণা করতে করতে সারা গ্রাম ঘুরল ঃ 'আজ প্রবল বৃষ্টি হবে বটে।'

সেদিন তো নয়ই, সারা মাসে বৃষ্টিই হয়নি।

একবার বলল, 'ভূমিকম্প আসন্ন।'

কিছুই হয়নি।

একবার বলে, 'পরানের যমজ ছেলে হবে।'

হল তো না। উলটে বউটাই মরে গেল। পেটে টিউমার হয়েছিল।

লোকে পাগলটার নাম দিয়েছে, গবাপাগলা। কারণ, খাবার সময় সে গবগব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে খায়। গ্রামের ছেলেরা তাকে খুব ভালোবাসে। কারণ গবা খেলাধুলোর খুব ভক্ত। গ্রামের যে-কোনো খেলা হলেই মাঠের ধারে তাকে দেখা যায় উৎসাহীদের ভিড়ে। বলতে থাকে তার একটাও না-ফলা ভবিষ্যদ্বাণী।

সেই গবাই একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে।

বাজারের মধ্যে দিয়ে কালির কনভয় যাচ্ছিল। কনভয় বলাই ভালো। কারণ, কালি বসে একটা হুড খোলা জিপে। তার সামনে পিছনে থাকে কুড়িটা বাইক। বাজারে ভিড় থাকার দরুন কনভয় আস্তে চলছিল। মাঝে মাঝে থেমেও যাচ্ছিল। এমন সময় গবা রাস্তার মাঝে কনভয়ের সামনে লাফিয়ে পড়ে। আর নাটকীয় ভাবে কালির দিকে আঙুল তুলে বলেছিল, 'তোর দিন শেষ। সর্বনাশ তোর মাথায় পা তুলে লাইচবে বটে।'

কালি প্রাথমিকভাবে থমকে যায়। তারপরে যখন সম্বিত ফিরে পায় তখন দ্যাখে গবা উধাও। কালির শাগরেদরা বোঝায়, লোকটা আস্ত পাগল। কালি শান্ত হয়। তারপর বাজার ছেড়ে কনভয়টা এগিয়ে যায়। বাজারে ধুলো ওড়ে। আরও একটা জিনিস ওড়ে। তা হল বিশ্বাস। বাজারের সব মানুষের মনে একটা বিশ্বাসের বুদবুদ উড়তে লাগল, 'হায়, গবার ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্যি হতো!'

ঘোষবাবু বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় তাঁর ভেতরকার মেয়েমানুষই বলে ওঠে, 'মিনসে, তোর কি আর কোনো কাজ জুটবে না? কালির পিছনে হাওয়া দিয়ে বেড়াস। কালি একটা মানুষ? গোটা অঞ্চলের মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত করে রেখেছে। লাশের পাহাড়ে বসে আছে। আর তুই তাকে তালপাতার পাখার বাতাস করছিস?'

ঘোষবাবু এবার বলেন, 'তুই বুঝবি না রে মাগি—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। শক্তিতেই ভক্তি। এভাবেই দুনিয়া চলে বুঝলি। আর বুঝবি বা কী করে? মেয়েমানুষের বুদ্ধি বলে কথা! তোর হাত কাপড়ে কাছা হয় না।'

এবার তার ভেতরের মেয়েমানুষটা বলে, 'তা বুঝব কী করে? তুই তো মহাপুরুষ, নিজের বউটাকেই বাগে আনতে পারলি না। অন্য পুরুষে মজে আছে। যা না, বউটাকে দু-ঘা দে। তা তো পারবি না। আসলে তুই কালিকে সমর্থন করিস। তোর ভেতরকার পুরুষটাকে সন্তুষ্ট করতে। যা তুই পারিস না, কালি পারে। তাই কালির পিছনে তেল দিস।'

ঘোষবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় মাঠ ফুঁড়ে গবার আবির্ভাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঙুল তুলে বলে, 'তুই মরবি তোর ভেতরের মেয়েটার হাতে।' তারপর চলে যায়। ঘোষ অবাক হয়ে ভাবেন, ব্যাটা জানল কীভাবে? সত্যি তো, এটা তো কারুর জানার কথা নয়! একমাত্র মা জানত। সে নিজে ছাড়া। যে তার ভেতরে একটা মেয়েমানুষের প্রাধান্য প্রকট। পুরুষটা প্রায় কোণঠাসা।

তিনি ছিলেন তাঁদের বংশের একমাত্র ছেলে। তাই মা তাঁকে ছোটবেলা থেকেই এত আদর যত্ন দিয়েছেন, তাতে তাঁর ভেতরকার পুরুষমানুষটার বিকাশই ঘটেনি। ছোটবেলায় মা তাঁকে ভালোবেসে সাজাত। কাজল পরানো থেকে শুরু করে শাড়ি পর্যন্ত পরাতেন। তাঁর ভালো লাগত মা যখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতেন, মনে হত তিনি মা হয়ে গেছেন। ছেলেদের খেলাধুলো —মাঠ, পুকুর, গাছে ওঠা—এসব তাঁর আয়ত্বের বাইরেই থেকে গেছে।

কালবৈশাখীর ঝড়ে যখন মাঠে আম কোড়ানোর ধুম, তিনি তখন খাটের নীচে পুতুলের ঘর সাজাতে ব্যস্ত ছিলেন। বিপদ বাধল যখন মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর পড়াশুনো শেষ হয়ে গেছে। তিনি ভালো স্টুডেন্ট।

মা বললেন, 'আমি না থাকলে তোর কী হবে? একটা বিয়ে কর বাবা।'

তিনি অমত করেননি। তিনি মায়ের বিরোধিতা করতেই শেখেননি। অসুস্থ অবস্থায় মা বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। তাও গ্রামের ডাকসাইটে সুন্দরীর সঙ্গে।

বিয়ের পরদিন মা গত হলেন। এক সপ্তাহ পরে জানতে পারলেন তাঁর বিয়ে করা বউয়ের মন পড়ে আছে অন্য কারুর জন্য। সে এখন পলাতক।

ফিরে আসার পর থেকে নিজের বন্ধুকে চিনতে পারছে না শঙ্কু। বেশ তো ছিল! খেলাধুলো, দুষ্টুমি এসব নিয়ে। ফিরে আসার পর দেখছে এ কোন মানুষ! মুখে হাসি নেই, চোখে চঞ্চলতা নেই, সারাক্ষণ চোয়াল শক্ত, দুচোখে ঝিমধরা দুপুরের গাছের পাতার মতো স্তব্ধতা। আগে যার মুখে খই ফুটত, আজ তার মুখে কথা নেই। সারাক্ষণ কী যেন ভাবে।

শঙ্কু একদিন প্রশ্ন করেই ফেলল, 'চুপ করে কী ভাবিস, মাধো?'

মাধো বিড়বিড় করে বলে, 'তুই বুঝবি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শঙ্কু অভিমান করে বলে, 'আমি বুঝব না? এতটুকু বয়স থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছি। আমি তোকে হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় চিনতাম। এখন চিনতে পারছি না হয়তো ঠিকই। আমার মাথাটা একটু মোটা। বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি তোর বন্ধু। একটু বুঝিয়ে বল না কী চাই? কী করতে হবে? তোর জন্যে তো সবই করে এসেছি। আবার করব।'

মাধো অন্যদিকে তাকায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'সময় আসেনি।'

শঙ্কু বলে, 'কীসের সময়?'

এবার মাধো একটু হাসে। বন্ধুর অসহায় অবস্থা দেখে। তারপর বলে, 'কীসের সময়? ফসল কাটার।'

শঙ্কু অবাক হয়ে বলে, 'তুই আবার চাষা হলি কবে থেকে? ফসল কাটার সঙ্গে তোর কী সম্বন্ধ?'

মাধো কিছু বলে না। গাছের নীচে বসে ছিল ওরা। এবার মাধো ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে।

শঙ্কু কী করবে ভেবে পায় না। বসেই থাকে। মাধো ঘাসের ওপর শুয়ে থাকে। ওর চোখে আকাশের ছায়া।

তিন বছর আগে সাজিদ মাস্টার খুন হওয়ার পর মাধোকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে ওর এক কাকা বেলগাছিয়ায় ভেটেরিনারি কলেজে চাকরি করেন। তাঁর কাছেই ছিল এতদিন। এক মাস হল ফিরেছে। ফিরে ইস্তক অস্থিরভাবে ঘুরছে এখানে-ওখানে। কোনো কিছুতে মন নেই। যেন ভূতে পাওয়া এক মানুষ। সে কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু কেউ বুঝছে না। সে কিছু করতে চাইছে, কিন্তু করতে পারছে না।

শঙ্কু তার ছায়াসঙ্গী। কিন্তু সে-ও দ্বিধায় পড়ে গেছে। শঙ্কু মাধোর চেয়ে বয়েসে বড়, চেহারাতেও বড়। কিন্তু সে-ও সবার মতো মাধোকেই নেতা মনে করে। মাধোর কর্তৃত্বকে সম্মান করে। এখন নেতার হাবভাব দেখে সে-ও ফাঁপরে পড়ে গেছে। বিপদ বেঁধেছে গবাপাগলার ভবিষ্যদ্বাণীকে নিয়ে।

মাধো ফিরে আসার দুদিন পর একদিন খেলার মাঠে গবাপাগলা মাধোকে দেখতে পায়। মাধোকে সে চিনত না। কারণ, মাধো কলকাতার চলে যাওয়ার পর গবার উদয় হয়েছিল বেন্দাই গ্রামে।

মাধো খেলছিল না। মাঠের পাশে বসেছিল। গবা মাধোকে দেখে আকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাটানো অট্টহাসি হেসে ওঠে। ছেলেদের খেলা বন্ধ। সবাই গবা ও মাধোর দিকে তাকিয়ে। গবা হাসি থামিয়ে মাধোর দিকে আঙুল তুলে বলে, 'এ ছেলে তো প্রলয় নিয়ে এসেছে বটে। প্রলয়, প্রলয়, মহাপ্রলয়।' সবাই শুনেছিল। কিন্তু গবাপাগলার ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যর্থতার কথা ভেবে ভুলেও গিয়েছিল।

শঙ্কুর কেমন মনে হয়েছিল, গবা ঠিক বলছে না তো? মাধোর চেহারার মধ্যে সত্যিই তো এক ঝড়ের পূর্বাভাস।

মাধো শুয়েছিল গাছের নীচে, ঘাসের ওপরে। শঙ্কু পাশে বসে। এবার শঙ্কু অস্থিরভাবে বলে, 'এভাবে চুপ করে থাকলে হবে, কিছু অন্তত বল। এভাবেই যদি থাকবি, তবে ফিরে এলি কেন কলকাতা থেকে?'

মাধো এবার উঠে দাঁড়ায়। মাথার লম্বা চুলগুলো আঙুল দিয়ে ঠিক করে। তারপর অদ্ভুত চোখে শঙ্কুর দিকে তাকায়। শঙ্কু সে চাহনির গভীরতা ধরতে পারেনি। আবার প্রশ্ন করে, 'কলকাতা থেকে তবে এলি কেন?'

এবার মাধোর চাপা গলা শোনা গেল। মনে হল, বিকেলের পাখিদের সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেছে, পৃথিবীর সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, শঙ্কু যেন পক্ষাঘাতে স্থবির হয়ে গেছে। সে নিশ্বাস নিতে পারছে না। হৃৎপিণ্ড থেমে গেছে।

শঙ্কু যখন সংবিত ফিরে পেল তখন মাধো মাঠের আল ধরে একা একা দিগন্তে মিশে যাচ্ছে। প্রকৃতিতে এখনও যেন ধ্বনিত হচ্ছে মাধোর উত্তর, 'কেন এলাম? এসেছি তোদের উদ্ধার করতে।'

অনুর মনে সুখ নেই। রেডিয়োতে গান বাজে, 'হলুদ বনে বনে, আমার নাকছাবিটি হারিয়ে, আমার সুখ নেইকো মনে।'

অনুর অবশ্য নাকছাবি হারায়নি। হারিয়েছে ওর মনের মানুষটি। হারিয়েছে অবশ্য অনেকদিন। প্রায় বছরদুয়েক। যখন ওর বিয়ে হল ঘোষবাবুর সঙ্গে। এ বিয়েতে ওর মত ছিল না। কিন্তু ওর বাবা তার পায়ে কেঁদে পড়েছিল। বলেছিল, ও যদি মত না দেয় তবে জমি-জিরেত সব কালি নিয়ে নেবে। সবই নাকি বন্ধক দেওয়া কালির কাছে। একমাত্র ঘোষবাবুই পারে তা আটকাতে, কারণ, সে কালির ডান হাত। কালির অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

অনু ওর মনের মানুষকে একটা চিঠি লেখে কলকাতায়। চিঠির জবাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এল, 'পৃথিবীর কোনো বন্ধনই আমাদের এক হওয়া থেকে আটকাতে পারবে না। তা কারুর সঙ্গে তোমার বিয়ের বন্ধনই হোক না কেন।'

অনুর ভালো লেগেছিল। সত্যিই তো, মন যাকে আপন করে সেই তো আপন, সামাজিক চাপ থাকে আপন বাসায়। সে কী করে আপন? সে দায় সমাজই নিক। ও নেবে না। অন্তত মন থেকে। আর ওর মনের মানুষ ওকে পর ভাবে না, আর ভাববেও না। বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ে ও। ওইটুকুই। কিন্তু তারপর থেকে ঘোষবাবুকে ও ওর ত্রিসীমানায় আসতে দেয়নি আজ পর্যন্ত। ওর মনে সুখ নেই।

বছরতিনেক আগেও যে মানুষটা ওর পিছন পিছন ঘুরত, একবার দর্শনের জন্য যে মানুষটা দশ ঘণ্টা গাছতলায় বসে থাকত, একে ওকে দিয়ে মনের কথা শোনাত, তারপর কত চিঠি লিখত ইনিয়েবিনিয়ে, সেই মানুষটা কলকাতা থেকে ফিরে এসেই বদলে গেল। তিন-তিনটে বছর অহল্যার প্রতীক্ষায় বসেছিল অনু। ভেবেছিল ফিরে এসে প্রথমেই ওর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু ফেরার সাতদিন পরে অনু জানতে পারে, ওর মনের মানুষ ফিরেছে। অনুর ভারি অভিমান হয়। মাধো ফিরে এসেছে একথা ওকে জানতে হল শঙ্কুর কাছ থেকে। মানুষটি নিজে কেন এল না?

একদিন দুপুরে মুখোমুখি হল দুজনে। জঙ্গলের মধ্যে। অনু নিজেকে অনেক শক্ত করে গিয়েছিল। ভেবেছিল কঠিনভাবে নিজেকে প্রতিরোধ করবে। কিন্তু মাধোকে দেখে ওর চোখে জল এসে গেল। মানুষটা কী রোগা হয়ে গেছে! চোখের নীচে কালি, চুলগুলো রুক্ষ। ও আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ঝাঁপিয়ে পড়ে মাধোর বুকে। চোখের জলে মাধোর বুকে লিখে দেয় ওর তিন বছরের প্রতীক্ষা, অতৃপ্তি এবং যন্ত্রণার দিনলিপি।

সে পর্যন্ত ঠিক ছিল। অনু ভেবেছিল এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। সে তার মনের মানুষকে ফিরে পাবে। তারা পালিয়ে যাবে। এ-গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। যেখানে তাদের কেউ চেনে না—কেউ জানে না—শুধু তারা দুজন। আর তাদের সুখের সংসার। এ কথাটা সে মাধোকে বলেও ছিল। কিন্তু মাধোর উত্তর শুনে তার ভয়ে দমবন্ধ হয়ে গেছিল।

মাধো শক্ত গলায় বলেছিল, 'পালাব কেন? এ গ্রাম আমার। এখানকার মানুষেরাও আমার। এদের ভয় পাওয়ার কী আছে। এরা সবাই জানে তুই আমায় ভালোবাসিস। অবস্থার চাপে তোকে বিয়ে করতে হয়েছে। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থার পরিবর্তন হলে, সবাই মেনে নেবে। প্রয়োজন শুধু পরিবর্তনের। সে পরিবর্তন আসবে। হ্যাঁ, অনেক রক্তের দামে। সে পরিবর্তন আমিই আনব। পালাব না।

'যে একবার পালিয়ে যায়, তাকে সারাজীবনই পালিয়ে বাঁচতে হয়। সে জীবন তোরও না, আমারও না। আমরা ইতিহাস তৈরি করতে এসেছি রে অনু। সূর্য-চাঁদ কখনো পালায় না। একজনকে দিনের, আরেকজনকে রাতের আড়ালে মাঝে মাঝে লুকোতে হলেও সবাই জানে, তারা ঠিক সময় আবার আকাশ শাসন করতে আসবে। লুকোনোটা পালানো নয়, রণকৌশল। এক্ষেত্রে আমি তোর সূর্য, তুই আমার চাঁদ। আমরা আমাদের আকাশকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে কোথাও গিয়ে কি শান্তি পাব? আমি কি তোকে ভালোবাসতে পারব? আর তুইও কি আমায় সম্মান করতে পারবি?

'আমরা মুখোমুখি হব—সমস্ত ঝড়ের, সমস্ত বাধার। যদি মরে যাই তাহলে তো বটেই। যদি জিতে যাই তাহলেও আমাদের কথা মানুষের মুখে মুখে ফিরবে। দেখে নিস।'

অনুর গলা শুকিয়ে যায়। সে মাধোর বুকে মাথা গুঁজে দু-হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে। এ মানুষটাকে সে চিনতে পারে না। কিন্তু কী এক বিশ্বাস কাজ করে। হয়তো ও ঠিক বলছে।

মাধো বলে, 'অনেক মায়ের কোল শূন্য হবে, অনেক ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। হয়তো তোর ঘরও। আমার ক্ষমা করতে পারবি তো, অনু?'

অনু ঘাবড়ে যায়।

'কী সব বলছ! আমার হারানোর ভয় নেই। তুমি ছাড়া। আর আমি তোমার। আমি মনে করি, সব মানুষই নিজেকে ক্ষমা করেই নেয়। তাই তুমি আমার কাছে ক্ষমার অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।'

মাধো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মাধোর সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জঙ্গলের পাতারা, বিকেলের আকাশ। হয়তো মহাকালও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ঘোষ। তাঁর বিশাল বিছানায় শুয়ে। কী নেই তাঁর ঘরে! দামি দামি আসবাব, আধুনিক যন্ত্রপাতি, এয়ার কুলার। কিন্তু ঘরনিই নেই তাঁর ঘরে। ঘরনি থাকে নীচের তলার ঘরে। একই বাড়িতে তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে প্রতিবেশীর মতো। কেউ কারোর ব্যাপারে নাক গলায় না। আছে এক দুঃসম্পর্কের বিধবা বোন, কাজের মাসি কমলা, কাজের লোক অনেক আছে। কিন্তু তারা বাইরেই থাকে, চাষ করে, গাছের তদারক করে, বাগান দেখাশোনা করে।

ঘোষ বিছানায় শুয়ে সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে। সেটা ঘুরেই চলেছে। হঠাৎ-ই তাঁর ভেতরকার মেয়ে মানুষটা বলে ওঠে, 'নীচে তোর বউ পায়েস রান্না করছে।'

ঘোষ বলেন, 'করুক না, গৃহস্থ বউরা রান্না তো করেই থাকে।'

মেয়ে মানুষটা খিলখিল করে হেসে ওঠে ঃ 'তুই তো সাতজন্মে পায়েস খাস না।'

ঘোষ বলেন, 'তাতে কী হল? বাড়ির বাকিরা খাবে।'

মেয়েছেলেটা বলে, 'বাকিদের জন্য এ রান্না হচ্ছে না।'

ঘোষ বিরক্ত, 'তবে কার জন্য হচ্ছে রে, মাগি?'

মেয়েছেলেটা বলে, 'আজ ওই ছোঁড়ার জন্মদিন।'

ঘোষবাবু রেগে যায়, 'শালা, বেজন্মার বাচ্চা বেজন্মা। ওর জন্মেরই ঠিক নেই। ওর জন্মদিন হয় কী করে? ওকে তো কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল।'

মেয়েছেলেটা এবার গম্ভীর গলায় বলে, 'হ্যাঁ, তা গিয়েছিল। কিন্তু চার্চের ফাদার ওর নাম, পদবি এবং জন্মদিনও ঠিক করে দিয়েছিল। বুঝেছিস?'

ঘোষ গুম হয়ে থাকেন। মনে মনে মায়ের ওপর ভীষণ রাগ হয়। কী দরকার ছিল বিয়েটা দেওয়ার! ভেতরের মেয়েছেলে বুঝতে পারে। বলে, 'মাকে দোষ দিয়ে কী হবে। একটা সোমত্ত মেয়েমানুষ। কী চায় বুঝিস না? শরীর, শরীর। একবার না হল ফেল মেরেছিস। আরেকবার চেষ্টা কর না। প্রতিবারই কি এক ঘটনা ঘটে? অন্য কিছুও তো হতে পারে। পুরুষ মানুষটাকে সজাগ কর।'

ঘোষের হাড় হিম হয়ে যায়। মনে পড়ে যায় প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা। মনে করার চেষ্টা করে। ছেঁড়া, ছেঁড়া কিছু ছবি ভেসে ওঠে তাঁর চোখে। নববধূর সাজে তাঁর বউ খাটে বসে আছে। তিনি বউয়ের হাত ধরেন। সে হাত মাছের রক্তের মতো ঠান্ডা। বউয়ের মুখে বিদ্রুপের হাসি।

ঘোষের দু-চোখ জ্বালা করে। যেন তাঁর শরীরে প্রবল জ্বর। তিনি বউয়ের দু-কাঁধ ধরে নিজের দিকে টানেন। ঠিক সেই সময়ই বউয়ের মুখটা মায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো হয়ে যায়। ঘোষবাবু ছিটকে সরে যান। সরে যেতে গিয়ে পড়েও যান খাট থেকে। মা-রূপী বউয়ের মুখে এবার ক্রোধের ছায়া। ঘোষ হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। অনেক পরে নিজেকে আবিষ্কার করেন অন্য একটা ঘরের তক্তপোশের নীচে। এখন তাঁর সত্যিই বেদম জ্বর। এক প্রবল আত্মদহন, লজ্জায় বুক পুড়ে যাচ্ছে।

পরে তাঁর ভেতরকার মেয়েছেলেটা বলেছিল, 'ওসব নাকি তার মনগড়া। আসলে যা ঘটেছিল, তা নাকি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং লজ্জাকর। সেটা সে মেনে নিতে ভয় পায়। বউয়ের মধ্যে মাতৃদর্শন এক ধরনের ছেনালিপনা। নিজের ভেতরকার পুরুষটাকে সন্তুষ্ট রাখার এক ধরনের ফিকির।'

ঘোষ এসব কথায় কান দেন না, বিশ্বাসও করেন না। কিন্তু তিনি কী বিশ্বাস করেন, সে-বিষয়টাও তাঁর কাছে ধোঁয়াটে। আসলে তিনি মনে হয় বিষয়টাকে ধামাচাপা দিতে চান—সকলের কাছে এবং সর্বোপরি নিজের কাছে।

এ অঞ্চলের সত্তরভাগ জমিই কালির। অবশ্যই বকলমে। বাকি তিরিশ ভাগ যাদের, তাদের ওপর হুমকি চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। এবার ঘটল ঘটনা। হরেন কাকাকে কালি পুড়িয়ে মারল। তারই ভেড়ির পাশে। হরেনকাকার দোষ, সে কালিকে তার ভেড়ির অংশ দিতে চায়নি।

খবরটা শুনে মাধো গ্রামের সব মানুষকে নিয়ে গেল বিডিও অফিসে। ঘেরাও হল অফিস। একটা বিহিত চাই। বিডিও নানা বাক্যে তাদের সামলে গ্রামে পাঠিয়ে দিল। মাধো এবার সবাইকে নিয়ে পৌঁছল ডি.এম.-এর কাছে। গিয়ে দেখা গেল ডি.এম. সুধাকর বোস মাধোকে চেনে। বেলগাছিয়ার টোটোন দাদার বন্ধু।

সুধাকর মন দিয়ে শোনে। তারপর বলে, 'আমি পুলিশ প্রোটেকশন দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আপনারাও সজাগ থাকুন।

তারপর মাধোকে একা ডেকে বলে, 'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, টোটোনরা কী বলত...এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই যখন ভক্ষক, তখন তোমাকেই হতে হবে রক্ষক। দল বানাও, প্রতিরোধ গড়ে তোলো। রাজনীতির ঝান্ডার আড়ালে ও লুম্পেনটাকে উৎখাত করো। যদিও অফিসিয়ালি আমি কিছুই করতে পারব না। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে আছি।

'কালির মতো লোকে ছেয়ে গেছে দেশটা। আগে এগুলোকে পিষে মারতে হবে। তারপর না হয় সমাজ বিপ্লব হবে। একটা কথা মনে রেখো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়ের দাওয়াই একমাত্র ভয়ই।'

তারপর গ্রামে পুলিশ মোতায়েন হল। কিন্তু একদিন দেখা গেল যারা কালিকে ভেড়ির অংশ দিতে রাজি হয়নি, তাদের ভেড়িতে মাছ ভেসে উঠল। মরা মাছ। গ্রামের বাতাস ঘন হয়ে গেল মানুষের কান্না ও মরা মাছের পচা গন্ধে।

মাঠের মাঝখানে বসে দলবেঁধে আড্ডা মারছিল শঙ্কু, সুদাম, নাড়ু, দিলীপ—বেশ কয়েকজন। এমন সময় ওরা দেখল মাঠ পেরিয়ে এগিয়ে আসছে মাধো। সে এসে ওদের পাশে বসল। মুখ থমথমে। বন্ধুরা কেউ কোনো কথা বলতে পারছে না। এক সময় সে মুখ খোলে, 'তোদের নিজেদের পুরুষ ভাবতে লজ্জা করে না?'

এই ছিল শুরু। তারপর সন্ধে নামা অবধি চলল তার ভাষণ। সন্ধের পরে তারা সবাই যখন উঠে দাঁড়াল, তখন তারা অন্য মানুষ। কোনো এক নিষিদ্ধ রাজদণ্ড হাতে নিয়ে তারা যেন অভিষিক্ত হয়েছে এক একটা নিষিদ্ধ সিংহাসনে।

তারা এগিয়ে যায় মাথার ওপর চাঁদকে সাক্ষী রেখে। এক দুর্জয় পথ অতিক্রম করার শপথ নিয়ে। জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাওয়ার পথে একটা কালীমায়ের থান আছে। একটা হ্যারিকেনের আলো দেখা যায় লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে অনু দাঁড়িয়ে। হাতে একটা থালা। তাতে তেল সিঁদুর। প্রথমে মাধো, পরে সবাই দাঁড়িয়ে। অনু কপালে তিলক পরিয়ে দেয়। শঙ্কু মনে মনে ভাবে, তবে কি অনু সব জানত? তাদের সিদ্ধান্তে আসার আগের ও পরের কথা?

দূরে গবাপাগলার গলা শোনা যায়, 'ভূমিকম্প, ভূমিকম্প।'

ভেড়ির জলে বিষ, কথাটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল, গোটা জেলা জুড়ে। ছেলেদের খেলার মাঠে, বুড়োদের বটতলায়, মেয়ে-বউদের স্নানের ঘাটে—সর্বত্র একই আলোচনা। সবার মনেই ক্ষোভ। সবার সমালোচনার চাঁদমারি একটাই—কালি। সাহস করে কেউ কিছু বলতে পারছে না। কিন্তু মনে মনে সবাই চটছে। এর প্রতিকার হোক। আজ ভেড়ির জলে, কাল খাবার জলেও তো বিষ মেশাতে পারে। সাধারণ গ্রামবাসীর নিরাপত্তা বলে তো কিছুই রইল না। সবাই মনে মনে কালির সর্বনাশ চাইছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনটা ছিল দোলের আগের দিন। উৎসব হল বুড়ির ঘর পোড়ানো। কিছুই না, অপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র জড়ো করে তাতে খড় ও কাঠ দিয়ে একটা অবয়ব তৈরি করে তাতে আগুন দেওয়া। 'ওই জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক' প্রকৃতির এক ধরনের উৎসব। এবার বসাক পাড়ার বুড়ির ঘরটা সবচেয়ে বড় হয়েছিল। প্রায় বারো ফুট উঁচু। সন্ধেবেলা ঘরে আগুন দেয়া হবে। বিকেল নাগাদ লোকে এসে দেখল, গবাপাগলা আলকাতরা আর নিমের ডাল নিয়ে তাতে কী লিখছে। লেখা শেষে সে যখন থামল, সবাই দেখল লেখা আছে 'কালি'। আর যায় কোথায়! সারা গ্রাম ছুটে এসে হই হই করে তাতে আগুন দিল। তাদের মন কিছুটা যেন হালকা হল।

পরেরদিন ঘটল অভাবনীয় ঘটনা। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তটা অত্যন্ত দুর্গম। প্রায় পুরোটাই জলাভূমি। সংযোগের জন্য সামান্য আল। এই পশ্চিমেই ছিল কালির চোলাই মদের কারখানা। দোলের দিন কারা কে জানে সেখানে আক্রমণ করে। এবং কারখানায় আগুন লাগিয়ে দেয়। গোটা কারখানা তুবড়ির মতো ফেটে যায়। কারখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা সবাই মরে গেছে। দোষীদের শনাক্ত করার কেউ নেই। এক বুড়ো জাল দিচ্ছিল। সে বলে, একদল ছেলে ওই পথে গেছিল। তাদের সারা মুখে রং, তাই চেনা যায়নি।

খবরটা পুলিশে জানানো হয়নি। কিন্তু কালির প্রতিক্রিয়া হল ভয়ঙ্কর। বলে, 'ঘোষবাবু, আমি এই ছোকরাগুলোর ছাল ছাড়িয়ে নেব।'

ঘোষ চিন্তিত গলায় বলেন, 'কোন ছোকরাগুলোর? কার কার ছাল ছাড়াবে? তুমি কাকে চেনো? আমরা এখানো জানি না কাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নামছি। কয়েকজন মানুষ, না গোটা গ্রাম! তোমার শত্রুর তো অভাব নেই, কালি।'

কালি তখন প্রায় মারমুখী। বলে, 'তা হলে খবর নাও। আজই নাও। আজকেই জানতে চাই, কে বা কারা আমার মাথায় পা দিতে চাইছে। এমন শাস্তি দিতে হবে যে সাতপুরুষও ভয় পাবে শাস্তির কথা ভেবে।'

বুড়ো বটতলার নীচে সাধারণত বসে গেঁজেল বিশু। সারাদিন কাজ করে ইট-ভাটায়। বিকেল থেকে বসে গাঁজা নিয়ে, জুটে যায় কিছু সঙ্গী-সাথীও। সেদিনও বসেছিল। একপ্রস্ত গাঁজায় দম দেয়াও হয়ে গেছে। সেদিন সঙ্গী-সাথী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ ছিল না। বিশুকে গেঁজেল বিশু না গেজেট বিশু বলা হয় তা নিয়ে মতান্তর আছে। আসলে বিশু এ অঞ্চলের সব খবর রাখে। কার সঙ্গে কার ঝগড়া, কার সঙ্গে কার ভাব, কার মনে রং ধরছে, কার বউ কার সঙ্গে আশনাই করে—সব খবর তার নখদর্পণে।

বিশু আরেকপ্রস্ত দম দেওয়ার জোগাড় করছিল, কিন্তু চারজন মানুষের উদয় হল। চারজনকেই সে চেনে। চারটেই খুনে। কালির চ্যালা। নগেন নামের খুনেটা মুখ খোলে, 'কী রে শালা গেজেট! বল দেখি সেদিন কারখানায় কারা আগুন দিয়েছিল?'

বিশুর এখন শাঁখের করাতের অবস্থা। মগজ বলছে, বলে দে। কারণ এসব তথ্য ভাগ করতে তার ভালো লাগে। আবার অন্য দিকে মন বলছে, বলিস না।

সে বলে ওঠে, 'আমি তো জানি না।'

চারজন বটতলায় ওকে ঘিরে বসে। নগা বলে, 'সেদিন ওই খৃস্টর ব্যাটা কোথায় ছিল?'

বিশু বলে, 'সেদিন পরান মণ্ডলের গরুটা বাচ্চা দিয়েছে। মাধো তো সেখানে ছিল—বাচ্চা বিয়োচ্ছিল।'

চারজনের একজন বলে, 'ও কি ডাক্তার নাকি?'

বিশু বিজ্ঞের মতো বলে, 'ডাক্তারের বাবা। কলকাতায় ও তো গরু-ছাগলের হাসপাতালেই ছিল। ও সব জানে। ডাক্তারদের থেকে হয়তো বেশিই জানে।'

নগা এবার অস্থির গলায় বলে, 'তা হলে কে আগুন লাগিয়েছে, তুই জানিস না?'

বিশুর মাথায় হঠাৎ গাঁজার নেশা ধাক্কা মারে, 'জানলেও বলব না। যা করার করে নে শালা, গুখেকোর বাচ্চা।'

চারজন একে অপরের দিকে তাকায়। তারপর চোয়াল শক্ত করে।

পরের দিন বিশুর দেহটা পাওয়া গেল বটগাছটার সঙ্গে বাঁধা অবস্থায়। মৃত্যুর কারণ তখনই জানা গেল না। পুলিশ এল। মৃতদেহ নিয়ে গেল। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে জানা গেল, বিশুর পেটে সাতটা শিঙি মাছ পাওয়া গেছে। আর সেগুলো বিশুর মুখ দিয়েই ঢোকানো হয়েছিল।

শিউরে উঠল গোটা অঞ্চল। মানুষ এত নিষ্ঠুরও হাতে পারে? বিশুর বিধবা বউটা কেঁদে পড়ল পঞ্চায়েতের পায়ে। সবাই শোকে স্তব্ধ। চার্চের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাদার নীরব দৃষ্টিতে ভিড়ের মধ্যে থাকা মাধোর দিকে তাকায়। মাধোর মুখ নির্বিকার। একসময় সে বিড়বিড় করে, যা কেউ শুনতে পায় না বিশুর বউয়ের কান্নার শব্দে।

শঙ্কু ছিল মাধোর পাশে। সে-ই কেবল শুনতে পায়। শঙ্কু শিউরে ওঠে। মাধো কি মানুষ? না অতিমানুষ? এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, গোটা গ্রাম স্তব্ধ শোকে। রোঁয়াওঠা কম্বলের মতো ভয় গ্রামের মানুষকে জাপটে ধরেছে। তাদের নিজেদের ছেলেরাও কুঁকড়ে গেছে নিরাপত্তাহীনতায়! সেখানে মাধো বিড়বিড় করে বলছে, হয়তো নিজেকেই, 'ভয়ের দাওয়াই ভয়ই।'

আজ রবিবার। ছুটির দিন। কিন্তু কীসের ছুটি? মন্ত্রীমশাই তলব করেছেন। জরুরি দরকার। সকাল সকাল সুধাকরকে ছুটতে হচ্ছে সরকারি গেস্ট হাউসে। মন্ত্রী প্রেমাংশু বোস আবার সুধাকরের দুঃসম্পর্কের এক কাকা। অফিসিয়াল সম্পর্কের বাইরেও তাঁদের একটা সম্পর্ক আছে। এবং সে সম্পর্ক বেশ ভালো।

মন্ত্রীমশাই দু-চারজন মানুষের সঙ্গে নীচু গলায় কথা বলছিলেন। সুধাকরকে দেখে ইশারায় বসতে বলেন। সুধাকর একটু দূরত্ব রেখে একটা চেয়ারে বসে। একসময় লোকগুলো চলে যায়। মন্ত্রীমশাই দুটো চায়ের অর্ডার দিয়ে সুধাকরকে সামনে বসতে বলেন।

'কী সুধাকর! তোমার এলাকা তো রণভূমিতে পরিণত হয়েছে।'

'হ্যাঁ, স্যার। মার আর পালটা মার...।'

মন্ত্রী ভ্রু কুঁচকে বলেন, 'মানে?'

সুধাকর বলে, 'মানে, এতদিন কালিই মারছিল। এবার তার পালটা শুরু হয়েছে। এ তো হবারই ছিল স্যার। নিউটনের তৃতীয় সূত্রের মতো।'

মন্ত্রী বলেন, 'তা বলে সশস্ত্র এবং হিংসাত্মক রাস্তায়! গণতন্ত্র কোথায়?'

সুধাকর বলে, 'জাঁ পল সাত্রের মতে, সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ ষোলো আনা গণতান্ত্রিক।'

মন্ত্রী এবার বিরক্ত হন, 'থামো তো। তোমাদের যত অতি বামপন্থী লেকচার। আমার এদিকে মাথা খাচ্ছে। পাগলা কুকুরের মতো অবস্থা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতগুলো লোক মরল কী করে? তোমরাই বা কী করছিলে?'

সুধাকর বলে, 'স্যার আমি তো নামেই ডি.এম.। সব ক্ষমতা তো আপনারা কালিকেই দিয়ে রেখেছেন। আমার কাজ তো অফিসে বসা আর সই করা।'

মন্ত্রী বলেন, 'তা তোমার কালির ওপর এত রাগ কেন?'

সুধাকর লজ্জায় জিভ বার করে, 'না, না, স্যার, রাগ করব সে সাহস আমার কোথায়! গত চার বছরে ১৫-২০টা খুন, তারপর আরও ১০০ টা কেস তো আমাকেই ধামাচাপা দিতে হয়েছে। সুতরাং আমি তো সামান্য মানুষ।'

মন্ত্রী এবার চুপ করে সুধাকরকে দেখেন। তারপর হেসে ফেলেন। এবার তার ভেতরকার 'কাকা'টা জাগ্রত হল, 'আচ্ছা বেশ, বুঝেছি। এবার বলো তো কী অবস্থা?'

সুধাকর এবার শান্ত গলায় বলে, 'অবস্থা সঙ্গীন। কালির কপালে দুঃখ আছে। তা আপনারাও আটকাতে পারবেন না।'

মন্ত্রী ভ্রু কুঁচকে বলেন, 'কেন, আমাদের সরকার কি চুড়ি পরে বসে নাকি?'

সুধাকর বলে, 'কীসের সরকার! আর কয়েকদিনের মধ্যে এ এলাকাটা মুক্তাঞ্চল হয়ে যেতে পারে।'

মন্ত্রী বলেন, 'এতদূর! একটু খুলে বলো দেখি।'

সুধাকর বলে, 'কালির অত্যাচার তো চলছিলই। দোলের দিন কিছু লোক কালির মদের কারখানায় আগুন দেয়। তার বদলে কালি, বিশু নামে একজনকে খুন করে শিঙি মাছ খাইয়ে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে। কিন্তু ফল হল ঠিক উলটো। কালির চ্যালা নগেন-সহ তিনজনের লাশ পাওয়া গেল গাছে ঝুলন্ত অবস্থায়। এবার বেধে গেছে সেয়ানে সেয়ানে যুদ্ধ।'

মন্ত্রী বলেন, 'পালটা মারটা দিচ্ছে কারা?'

সুধাকর বলে, 'আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না। গ্রামবাসীদের সাপোর্ট আছে।'

মন্ত্রী সুধাকরকে দেখে বলেন, 'তুমি কিন্তু বাঁকা খেলা খেলছ, ভায়া। আসল লোকের নাম বলছ না।'

সুধাকর গলায় হাত দিয়ে বলে, 'ঈশ্বরের দিব্যি স্যার। আমি কিছুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি না।'

মন্ত্রী বলেন, 'গ্রামবাসীরা কাকে সাপোর্ট করছে, কালির বিরুদ্ধে যুদ্ধে কে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তা তুমি জানো না? তুমি কি আমায় জ্ঞানী জৈল সিং ভেবেছ নাকি?'

সুধাকর হেসে বলে, 'ওসব কুটকচালি, তদন্ত ছেড়ে কালির মাথায় ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিন। শক্তি কোনো একটা পাত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন থাকলে পাত্রটায় জং ধরে, পাত্রের পরিবর্তন দরকার। পাত্র তৈরি হয়ে গেছে। এবার শুধু শক্তির পাত্র পরিবর্তনের সময়। কালের নিয়মে সেটা এমনিই হবে। আপনারা অনুঘটক হওয়ার সুযোগটা হারাবেন না।'

মন্ত্রী অন্যমনস্ক হয়ে যান। একটু পরে বলেন, 'সুধাকর, তুমি আমার সন্তানের মতো। আমি জানি তুমি একটা বড় কিছুর হদিশ জানো। দেখো, যেন বিপদে না পড়ি।'

সুধাকর বলে, 'স্যার এবারটা আমায় ছেড়ে দিন।'

জঙ্গলের মধ্যে আগুন জ্বলছে। আগুন ঘিরে গোটা পনেরো ছেলে। একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে মাধো। আজ সাতদিন সে ঘরে ফেরেনি। কালির গুন্ডারা তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।

মাধো বন্ধুদের খবর দিয়ে এনেছে। নতুন আক্রমণের জন্য সবাই বসে আছে। একজনের অপেক্ষায়। তার হাতেই আক্রমণের সাফল্যের চাবিকাঠি।

প্রতীক্ষার অবসান হল। অবশেষে এল অনু। মাধো বলে, 'এনেছিস?'

অনু একটা কাগজ মাধোর হাতে দেয়।

মাধো সেটা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে থাকে। তারপর সবার উদ্দেশে বলে, 'এই নাম্বারগুলো লিখে নে। এগুলো লরির নাম্বার। সামনের শুক্রবার কালির এই মাঝবোঝাই লরিগুলো আমরা হাইওয়েতে লুঠ করব। তারপর এই যে ঠিকানা আছে, তার কাছে পৌঁছে দেব। এ কালির পয়লা নম্বর দুশমন।'

শঙ্কু বলে, 'কালির শক্তিক্ষয় হবে। আর আমাদের শক্তি বাড়বে।'

দিলীপ বলে, 'আমাদের বাড়বে কীভাবে?'

মাধো বলে, 'এই মাছ বিক্রির টাকা দিয়ে আমরা অস্ত্র কিনব।'

সুদাম বলে, 'অস্ত্র পাব কোথায়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধো হেসে বলে, 'সে তোরা আমার হাতে ছাড়।'

রাত বাড়ে পায়ে পায়ে। অন্ধকার ঘন হয়। একে একে সবাই চলে যায়। আগুন তখনো জ্বলছে। মুখোমুখি মাধো ও অনু। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে, সময় বয়ে যায় সরীসৃপের মতো।

এক সময় অনু বলে, 'খাবার এনেছি, খেয়ে নাও।'

মাধো বলে, 'রোজ রোজ তোর এই পাকামি করার কী দরকার! আমার না খেয়ে থাকার অভ্যেস আছে।'

অনু কোনও উত্তর দেয় না। গম্ভীর মুখে বাটিতে ভাত মাখে।

মাধো বলে, 'তোর কি মনে হয় গ্রামের লোক আমার পাশে থাকবে?'

অনু একদলা ভাত নিয়ে মাধোর মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, 'হাঁ', মাধো সহজাত প্রতিক্রিয়ায় হাঁ করে করে ফেলে। মুখে ভাত ঢুকে যায়। এবার মাধো মুখে ভাত নিয়েই হাসতে থাকে। অনুও যোগ দেয় সে হাসিতে।...

গাছের পাতায় শিশির ঝরছে। মাধোর বুকে মাথা রেখে অনু শুয়ে ঘাসের শয্যায়। মাধো আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে। চোখ দুটো অনেক দূরের দৃশ্য দেখছে যেন। অনু মাথা তুলে মাধোকে দেখে। দেখতেই থাকে। তারপর বলে, 'আমাকে তোমার কপালের দুশ্চিন্তার রেখা করে রেখে দাও।'

মাধো বলে, 'দুশ্চিন্তার রেখা কেন?'

অনু হেসে বলে, 'কারণ, ওরা তোমাকে কোনোদিন ছেড়ে যাবে না।'

মাধো এবার স্থির চোখে অনুর দিকে তাকায়। তারপর বলে, 'টোটোনদার একটা গান মনে পড়ছে রে—একদিন ঝড় থেমে যাবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে।'

ঘোষবাবুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছে। ঘরের মধ্যে সাত-আট জন মানুষ—সবাই কালির চ্যালা। কালি অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে ঃ 'কী ভেবেছেন, ঘোষবাবু? আমি কিন্তু চুড়ি পরে বসে নেই। সব ক'টাকে ভেড়ির জলে পুঁতে দেব। আমার নাম কলিমুদ্দিন শাম্‌স। শালা আমার লরি লুঠ করা? শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে খুঁজে বার কর। তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা একটা করে ছাল ছাড়াব।'

চ্যালাদের একজন বলে, 'ওদের তো খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। সব ক'টা গড়ের জঙ্গলে ঢুকে রয়েছে।'

কালি গর্জন করে, 'ওসব আমি জানি না। দরকার হলে জঙ্গলে ঢুকে ওদের খুঁজে নিয়ে আয়।'

চ্যালাদের মুখ শুকিয়ে গেল। জঙ্গলের বহু জায়গায় চোরাপাঁক আছে, সঠিক পথে পা না বাড়ালে নির্ঘাত মৃত্যু। বহু মানুষ বীরত্ব দেখাতে গিয়ে পাঁকে ডুবে প্রাণ হারিয়েছে। গড়ের জঙ্গল সাধারণ মানুষের কাছে বিভীষিকা।

একজন চ্যালা বলেই ফেলে, 'জঙ্গলে যাওয়া এক রকম অসম্ভব।'

কালি খেঁকিয়ে ওঠে, 'তা হলে ওরা আছে কী করে?'

আরেক চ্যালা বলে, 'ওই খৃস্টের ব্যাটা জঙ্গলের সব চেনে, হাতের তালুর মতো।'

কালি চিৎকার করে, 'ওই শালাকে যে এনে দিতে পারবে, তার হাত আমি সোনায় মুড়ে দেব।'

কালির কথায় চ্যালাদের চোখ লোভে চকচক করে ওঠে।

ঘরের মধ্যে এক দমবন্ধকরা পরিবেশ। কালি পেন্ডুলামের মতো ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘুরে চলেছে। এক সময় ঘোষবাবু সবাইকে বাইরে যেতে বলেন। সবাই চলে যায়। এবার ঘোষবাবু কালির সামনে এসে দাঁড়ান। চাপা গলায় বলেন, 'কালি, একটা কথা তুমি কিন্তু ভাবছ না, বা ভাবতে চাইছ না। এই খুদে দুশমনেরা হঠাৎ মাছ ভরতি লরিই কেন লুঠ করল?'

কালি অস্থিরভাবে বলে, 'আমার ক্ষতি করবে বলে।'

ঘোষবাবু বলেন, 'কিন্তু লুঠ করা মাছ ইব্রাহিমকেই বেচল কেন?'

কালি বলে, 'ইব্রাহিম আমার দুশমন বলে।'

ঘোষবাবু বলেন, 'কিন্তু ওরা এত টাকা নিয়ে কী করতে চায়? দেখো কালি, যদি তোমার ক্ষতি করার জন্যে ওরা মাছ লুঠ করত, তাহলে ওরা মাছগুলোকে নষ্ট করত বা বিলিয়ে দিত। কিন্তু খুঁজে খুঁজে তোমার শত্রুর কাছেই সেই মাছ ওরা বিক্রি করল। এবং সঠিক দামও নিল। কেন? এরা তো কেউ ব্যবসায়ী নয়, আবার পুরোদস্তুর ডাকাতও নয়। এত টাকা এরা কেন জোগাড় করছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালি বলে, 'কেন আবার, ফুর্তি-ফার্তা করবে বলে!'

ঘোষবাবু অন্যমনস্কভাবে বলেন, 'বিষয়টাকে এত সোজা ভেব না, কালি। আমার কেমন ভয় করছে। আমি কিন্তু মহাপ্রলয়ের আশঙ্কা করছি।'

বছর তিনেক হল ওদের বিয়ে হয়েছে—সুধাকর এবং সুতপার। এখনো বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি। মানে ওরা চায়নি। বেশ আছে দুজনে। বিবাহিত জীবনকে হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো বানানোর জন্য তিন বছর যথেষ্ট। কিন্তু ওদের বিবাহিত জীবন ভালোই আছে। বেশ তাজা। যদিও এর পেছনে সুধাকরের একটা কুটনৈতিক চাল আছে।

ইউনিভার্সিটির এক দাদা, আশিসদা বলেছিলেন, 'বুঝলি, বউকে কখনো গৃহপালিত বানাবি না। চাকরি করাবি। যদি তা না হয়, তবে তোর অফিসের ঝামেলাগুলো বউয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিবি। তোর অফিসের সমস্যাগুলোর সমাধানের দায়িত্ব বউকে দিবি, বউয়ের মতামত নিবি, গ্রহণ করা না করা সেটা তোর ব্যাপার। কিন্তু বউয়ের মাথাটাকে অলস থাকতে দিবি না। যদি অফিসে সমস্যা না থাকে, তা হলেও বানিয়ে বানিয়ে সমস্যা তৈরি করবি। এতে লাভ, তুই অফিসে কতটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিস, কত প্রতিকূলতার মধ্যে—তার একটা আন্দাজ তোর বউ পাবে। তোকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া বা শপিং করানোর জন্য ঘ্যানঘ্যান করতে সাহস পাবে না। কারণ, তার মাথায় তখন তার সমস্যাগুলোই পাক খাবে। নিজের মেয়েলি সাতকাহনগুলো দূরে পালাবে। বউ আর বউ থাকবে না। একেবারে কমরেড হয়ে যাবে।'

সুধাকর আশিসদার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে আসছে। অফিসের সব কথাই সুতপার সঙ্গে সে শেয়ার করে আসছে। তিন বছর ধরে। সুতরাং সংসারে খুব একটা ঝামেলা নেই।

আজ সুধাকর একটু অন্যমনস্ক হয়ে চা খেতে খেতে দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে ছিল। সুতপা এক বাটি খাবার নিয়ে তার পাশে সোফায় বসে। খাবারটা সুধাকরের সামনে রাখতে রাখতে বলে, 'আজ আবার কী হল? আবার বেন্দাই গ্রাম সমস্যা?'

সুধাকর একটা সিগারেট ধরায়। চুপ করে থাকে। সুতপা এবার সুধাকরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গা ঘেঁষে বসে। বলে, 'বলো না, কী হয়েছে?'

সুধাকর বলে, 'এবার বোধহয় চাকরিটা গেল।'

সুতপা বলে, 'ও মা, চাকরি যাবে কেন? বালাই ষাট!'

সুধাকর এবার আস্তে আস্তে উত্তেজিত হতে থাকে। বলে, 'গ্রামে অস্ত্র ঢুকছে। একটা-দুটো নয়, অনেক অনেক।'

সুতপা বলে, 'অস্ত্র আনছে কে? কালি?'

সুধাকর বলে, 'না, না। যে অস্ত্র গ্রামে ঢুকছে কালির অস্ত্র সে তুলনায় নস্যি। মেশিনগান। মেশিনগান ঢুকছে গ্রামে। বুঝেছ?'

সুতপা আঁতকে ওঠে, 'ও মা, মেশিনগান আনছে কারা?'

সুধাকর বলে, 'কালির শত্রুপক্ষ।'

সুতপা বলে, 'কালির শত্রুপক্ষ মানে তো মাধো ফার্নান্ডেজ। সে তো বাচ্চা ছেলে। মেশিনগান পেল কোথায়?'

সুধাকর বলে, 'বাচ্চা ছেলে সে বিরাট বাহিনী বানিয়েছে গড়ের জঙ্গলে। গেরিলা ট্রেনিং দিচ্ছে। প্রতিদিন তার বাহিনীতে লোক বাড়ছে।'

এবার সুতপা বলে, 'সে ক্ষেত্রে তো প্রচুর অস্ত্র দরকার। এত অস্ত্র পাচ্ছে কোথা থেকে?'

সুধাকর বলে, 'অস্ত্র আসছে বাংলাদেশ থেকে।' একটু চুপ করে থেকে সে আবার শুরু করে, 'বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের এক বীর সৈনিকের নাম কাদের সিদ্দিকী, তার নেতা মুজিবর রহমানের পায়ে সে অস্ত্র সমর্পণ করে। একটা-দুটো নয় ৩১৫ ট্রাক অস্ত্র—যা আনা হল টাঙ্গাইল থেকে। কাদের সিদ্দিকী জানত সব অস্ত্রই জমা দেওয়া হল। কিন্তু সব দেশেই ঘোড়েল মাথার লোক থাকে। ৩১৫ ট্রাক নয়, তারও বেশি অস্ত্র ছিল। টাঙ্গাইলের বিভিন্ন মাঠে মাটির নীচে প্লাস্টিকে মোড়া অবস্থায় তা লুকোনো ছিল—উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায়। এত বছর পরে এখন সেই অস্ত্র চোরাবাজারে বিক্রি হয়ে চলে এসেছে বেন্দাই গ্রামে।'

সুতপা বলে, 'ওমা, ওইটুকু ছেলে, তার এত ক্ষমতা?'

সুধাকর বলে, 'এইরকম একটা নেতা পেলে আমাদের সত্তরের আন্দোলনটা জিতেই যেতাম।'

সুতপা বলে, 'আমি কিন্তু ছেলেটার ফ্যান হয়ে যাচ্ছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুধাকর বলে, 'না, না। বেশি ফ্যান হোয়ো না। এমনিই ওর ফ্যানের অভাব নেই। তা ছাড়া ওর আবার বিবাহিত মহিলাই পছন্দ। এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে শুনেছি ওর নাকি আশনাই আছে। তুমিও তো বিবাহিত। দেখো, আমায় আবার অনাথ কোরো না।'

সুতপা হো হো করে হাসতে থাকে।

সুধাকর বলে, 'হেসো না, হেসো না। তার নাকি নানা গুণ। ভালো কথা বলতে পারে, ভেটেরিনারি ডাক্তারদের থেকেও ভালো চিকিৎসা করতে পারে গবাদি পশুদের। ভালো মাউথ অরগ্যান বাজাতে পারে, ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সবার মাথা মুড়িয়ে খেতে পারে, সে যেখানে দাঁড়ায় সেখানে দুশো লোক দাঁড়িয়ে যায়। সে এখন কলকাতার নেতাদের কাছে একটা বড় থ্রেট। আমার কাকা মন্ত্রী প্রেমাংশুবাবুর চোখে ঘুম নেই। এই যুদ্ধে যদি কালি হেরে যায়, তাহলে ওনার এম.পি. শিপটা গেল। কারণ, কালির শক্তিতেই ওনার শক্তি। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার, মানে এখানকার বিরোধী শক্তিরা চাইছে, মাধো জিতে যাক। তা হলে প্রেমাংশুবাবু ভোটে হেরে যাবেন। নানা সমস্যা। তুমি একটু ভাবো কী করা যায়!' সুধাকর আরেকটা সিগারেট ধরায়।

AMARBOI.COM

এক মাস পার হয়ে গেছে, বেন্দাই অঞ্চল এখন যুদ্ধক্ষেত্র। বেদম মার খাচ্ছে কালির দল। একের পর এক লাশ পড়ছে। গ্রামবাসী মরিয়া। ভেড়ির জলে বিষ যে মেশাতে পারে, তাকে নির্বংশ না করলেই নয়। ভেড়ি তাদের মা। মায়ের অসম্মান কোন সন্তানইবা মেনে নিতে পারে।

মাধোর দলের চোরাগোপ্তা আক্রমণে কালির গুন্ডাবাহিনী ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে। তবু তারাও যে মরছে না তাও নয়। গ্রামের বেশ কিছু তাজা প্রাণ অকালে ঝরে গেছে। গ্রামে এখন শ্মশানের নিস্তব্ধতা। কালির বাইকবাহিনীদের আর দেখা যায় না। তারা গর্তে মুখ লুকিয়ে আছে। আর বিদ্রোহীবাহিনী গড়ের জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে, গ্রামে মিছিল করে হেঁটে, আবার জঙ্গলে উধাও হয়ে যায়।

এই মিছিলে গ্রামবাসীর মনোবল বাড়ে। কালির গুণ্ডাবাহিনী কুঁকড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়।

কলকাতা থেকে পার্টির বহু কুখ্যাত ক্যাডার এসেছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে। তাদের বেশির ভাগই মেশিনগানের গুলিতে মারা গেছে। পার্টি এখন কালির মাথা থেকে হাত তুলে নিতে পারলে বাঁচে।

এরকমই এক বিকেলে গড়ের জঙ্গলে অনুরাধাকে দেখা গেল হেঁটে যেতে। তার হাতে একটা থলে। জঙ্গলের মাঝখানে একটা গাছের নীচে মাধো শুয়ে আছে। তার বেদম জ্বর। তার পিঠে গুলি লেগেছে। সে সোজা হয়ে শুতে পারছে না। কাত হয়ে শুয়ে আছে। ন্যাপা আর হারু আছে তার দেখাশোনার জন্য, বাকি সবাই গেছে কালির একটা কোল্ড স্টোরেজ লুঠ করতে। অনু এসে মাধোর মাথাটা নিজের কোলে নিয়ে নেয়।

মাধো চোখ খোলে। একটু হাসতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না যন্ত্রণার জন্য।

অনুর চোখে জল এসে যায়। অনেক কষ্টে সামলে বলে, 'আমি হাসপাতাল থেকে ওষুধ এনেছি। এটা খাও, ব্যথা কমে যাবে। তার আগে একটু খাবার খাও।'

অনু তার থলে থেকে খাবার বের করে। একটা বোতলে ডালের জল। একটা চামচ দিয়ে মাধোকে খাওয়াতে থাকে।

সময় বয়ে যায়। একসময় মাধো উঠে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে। তার শরীর ভীষণই দুর্বল। পিঠের গুলিটা বের করা হয়ে গেছে। এখন শুকোনোর অপেক্ষায়। কিন্তু বারবার জ্বর আসছে। তার মানে ইনফেকশন এখনো যায়নি।

অনু একসময় বলে, 'আর তো ক'টা দিন, পিঠের ঘা-টা শুকিয়ে গেলেই তুমি উঠে পড়তে পারবে। তারপর কালির ভিটেতে ঘুঘু চরাতে হবে না!'

ন্যাপা বলে, 'হ্যাঁ মাধোদা, শালাকে উচিত শিক্ষা দিতেই হবে। ভেড়ির জলে বিষ মেশানো জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেব।'

মাধো চুপ করে বসে থাকে গাছে হেলান দিয়ে। তার জ্বর বাড়ছে। কী সব বিড়বিড় করছে। হয়তো জ্বরের প্রলাপ। অনু কিন্তু শুনতে পায়। যেহেতু সে মাধোর পাশে বসে আছে।

মাধো বিড়বিড় করে অনুর দিকে তাকিয়ে, 'তুই তো সত্যিটা জানিস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভালো লোক নই রে অনু, ভালো লোক নই।'

অনু সন্ত্রস্ত হয়ে মাধোর মুখ চাপা দেয়। তারপর সঙ্গী দুজনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'সন্ধে হয়ে আসছে, তোরা একটু আগুন জ্বালাবার চেষ্টা কর।'

সঙ্গী দুজন কাঠ জোগাড় করার জন্য জঙ্গলে অদৃশ্য হয়। অনু তারপর মাধোর দিকে তাকায়।

মাধো এলিয়ে পড়েছে। বিড়বিড় করছে, 'তুই তো সত্যিটা জানিস।'

সত্যিটা অনু জানে। কিন্তু কোনোদিনও প্রকাশ করবে না। এটাও অনু জানে, এ সত্য জানানো যাবে না। যায়ও না! কারণ অনু জানে ভেড়ির জলে বিষ কালি মেশায়নি। মিশিয়েছিল স্বয়ং মাধো। সে রাতে সাক্ষী ছিল একমাত্র অনু। কারণ জানতে চাওয়ায় মাধো বলেছিল, 'এতেই মানুষ জাগবে।'

অবশেষে মানুষ জাগল। দীর্ঘদিনের বঞ্চনার, অত্যাচারের এবং ভয়ের কালো চাদরটা সরিয়ে দুপুরের সূর্যের মতো। জনরোষে গোটা অঞ্চলটা কাঁপতে লাগল বেতস পাতার মতো। মানুষের পায়ের চাপে ধরিত্রীর ঘুম ভেঙে গেল। সাধারণ মানুষ নেমে পড়েছে পথে। যে যা পারে অস্ত্র হাতে ছুটছে কালির ঘোষিত-অঘোষিত সমস্ত দুর্গের দিকে।

কালির বাহিনী ছত্রখান। ভেড়ির জল রক্তে লাল। সাধারণ মানুষ এত সাহস দেখাতে পারত না। যদি না মাধোর বাহিনী তাদের পাশে থাকত। কালির গুন্ডাদের লাশ পড়তে লাগল তাসের মতো। গোটা অঞ্চলটাই মুক্তাঞ্চলে পরিণত।

ঘরের একটা চেয়ারে বসে নিউমোনিয়া রোগীর মতো কাঁপছেন ঘোষবাবু। খাটের ওপরে চিত হয়ে শুয়ে কালি চিৎকার করে বেসুরো গলায় গাইছে, 'দীনকে দয়া হয় না, মৌলা।'

বেহেড মাতাল। সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেছে। আসলে সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে কালির। তার প্রাসাদের মতো বাড়ি এখন খাঁ খাঁ করছে। বউ, বাচ্চা, আত্মীয়স্বজনকে পাচার করে দেওয়া হয়ে গেছে কলকাতায়। কালি শুধু যায়নি। সে বলেছিল, 'আমি এর শেষ অবধি দেখব। তাই দেখছে যেন সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে। গলা অবধি মদ তাকে দিয়ে গাওয়াচ্ছে, 'দীনকে দয়া হয় না মৌলা, দীনকে দয়া হয় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোটা বাড়িটায় প্রতিধ্বনি হচ্ছে, কালির বেসুরো প্রলাপ। গোটা বাড়িটায় শুধু কালি আর কালির ছায়াসঙ্গী ঘোষবাবু। ঘোষবাবু এমনভাবে বসে আছেন যেন তিনি সেই জুয়াড়ি, যার সব তাস শেষ হয়ে গেছে। গ্রামবাসীদের কোলাহলের শব্দ একটু একটু করে এগিয়ে আসছে।

ঘোষবাবু জানেন, এবার কী হবে। এই জনসমুদ্র এবার আছড়ে পড়বে এই বাড়িটার ওপর। তাদের দুজনকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। বড় যন্ত্রণাদায়ক সেই মৃত্যু। ঘোষবাবু উঠে দাঁড়ান, কালির কাছে এগিয়ে যান। কালিকে বলেন, 'আজ আসি, কালি। আবার দেখা হবে। হয়তো অন্য কোনো দুনিয়ায়, অন্য কোনো সময়ে।'

তারপর বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বাঁশবনে ঢুকে পড়েন। সেই পথ ধরে এগিয়ে চলেন নিজের বাড়ির দিকে। পিছনে পড়ে থাকে কোলাহল। তিনি জানেন এই কোলাহল এখনো তাকে ধাওয়া করেনি। এখনো কিছুটা সময় আছে।

ঘোষবাবুর ভেতরকার মেয়েটা হিসহিস করে বলে, 'তোর মতলব ভালো ঠেকছে না। তুই কী করতে চাস?' ঘোষবাবু কোনো উত্তর দেন না। দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ান।

AMARBOI.COM

অন্ধকার ঘর। একটা চেয়ারে অনু বসে। তার সামনে পায়ের কাছে ঘোষবাবু বসে। দুচোখ ভরা জল, সারামুখে বিশ্বের ক্লান্তি, বিশ্বের পরাজয়। ঘোষবাবু এই প্রথম অনুর এত কাছাকাছি বসে কত কথা বলছেন বা বলার চেষ্টা করছেন। অনু পাথরের মতো বসে থাকে।

'আমি জানি, আমি মহাপাতক। আমি তোমার যোগ্য মানুষই নই। আমার মেরুদণ্ড শক্ত নয়। তাই অন্যায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি নিজে কোনোদিন একটা পিঁপড়েও মারিনি। তোমার সঙ্গে কোনোদিন জোরজবরদস্তি করিনি।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘোষবাবুর ভেতরের মেয়েটা বলে ওঠে, 'মুরোদ থাকলে তো!' ঘোষবাবু বলে ওঠেন, 'আঃ।'

অনু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ঘোষবাবুর দিকে। সে দৃষ্টিতে সমুদ্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীরতা, আকাশের উদাসীনতা, বসুন্ধরার ধৈর্য, বাতাসের শীতলতা।

অনুকে দেখে মনে হচ্ছে, কোনো মানুষ নয়। যেন অন্য কিছু। কোনো বোধ, যা অর্জন করতে কোনো তপস্বীর শত-সহস্র বছর কেটে যায়। যেন কোনো গোপন আশ্রয়, যার সন্ধানে সূর্যালোকও পরাস্ত হয়। যেন কোনো গোপন মন্ত্র, যা জীবনে একবারই উচ্চারণ করা যায়।

ঘোষবাবু মুগ্ধ দৃষ্টিতে অনুর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'মা, তুমি আমায় মুক্ত করো...এই যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর হাত থেকে। আমার নিজের সে সামর্থ নেই। ওরা আমায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারবে। তুমি আমায় মুক্তি দাও।'

তারপর উঠে গিয়ে একটা ড্রয়ারের ভেতর থেকে রিভলভার বের করেন। এবং সেটা অনুর পায়ের কাছে যত্ন করে রাখেন। তারপর হাঁটু গেড়ে বসেন।

অনু চুপ করে বসেই থাকে। তারপর অনিবার্য নিয়তির মতো উঠে দাঁড়ায়। রিভলভারটা তুলে নেয় হাতে। ঘোষবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে যায়। মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। ঘোষবাবুর মনে হয় চারপাশে উলুধ্বনি শোনা যাচ্ছে, ঢাক বেজে উঠছে, শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছে। দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল।

AMARBOI.COM

বাড়ির বাইরে তুমুল কোলাহল। প্রথমদিকে বাড়ির দরজা-জানলায় ইট এবং পাথরবৃষ্টি হচ্ছিল। এখন সেটা থেমে গেছে। একটা কোলাহল গুঞ্জনে পরিণত হল। এবার কী? মাতাল হলেও কালির মাথায় এ প্রশ্নটা জাগে। চিত হয়ে শুয়ে কালি কড়িকাঠের দিকে তাকিয়েছিল। পায়ের শব্দে উঠে বসে। ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ। ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে একচিলতে রোদ এসে মেঝেতে পড়ছে। রোদের রেখাটা ঘরটাকে যেন দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। কালি চিৎকার করে, 'এ-পাড়ে আমি, ও-পাড়ে কে?'

ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ভুল করছ কাকা, এ-পাড়েও আমি, ও-পাড়েও আমি।'

কালি চোখ কুঁচকে তাকায়। আলোর ও পারে একজন দাঁড়িয়ে।

কালি বিড়বিড় করে, 'কে?'

ওপাশ থেকে গলা ভেসে আসে, 'আমি মাধো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালির হঠাৎ মনটা ভালো হয়ে যায়, 'মাধো! আয় বাবা, আয়। মনে কিছু রাখিস না। তোর আমার কোনো বিবাদ নেই রে। যুদ্ধক্ষেত্রে একজনকে তো শত্রুপক্ষ হতেই হয়। তাই না, বল? না হলে রাজা-রাজা খেলা কী ভাবে চলবে? যুগ যুগ ধরে তো এটাই চলে আসছে। তুই আমায় ভুল বুঝিস না। তুই যখন ছোট ছিলি, নদীর ধার থেকে তোকে তুলে আমিই তো চার্চের ফাদারের কাছে নিয়ে গেছিলাম। তারপর আমি তোকে সাইকেলে করে কত ঘুরিয়েছি, কত কী শিখিয়েছি—ছড়িখেলা, লাঠি খেলা, মায় বন্দুক চালানো অবধি। সে সব ভুলিসনি তো।'

মাধো মাথা নাড়ে, 'না কাকা, কিছুই ভুলিনি। তোমার দেওয়া শিক্ষাতেই এতদিন তোমার হাত থেকে বেঁচে আছি।'

কালি খুশি হয়। খাটের ওপর বসে দুলে দুলে হাসে। তারপর বলে, 'তা এবার আমায় নিয়ে কী করবি, বাপ?'

মাধো শান্ত গলায় বলে, 'তোমায় এখান থেকে বের করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেব—তোমার বউ-বাচ্চার কাছে।'

কালি অবাক হয়, 'আমায় মারবি না?'

মাধো শান্ত গলায় বলে, 'আমি মারব না। কিন্তু বাইরের ওরা মারবে। তাই আমি তোমায় নিতে এসেছি। সাবধানে বের করে দেব।'

কালি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়ে। বলে, 'না রে মাধো। আমি এ-বাড়ি, এ-গ্রাম ছেড়ে যাব না। ওরা আমায় যা করার করুক।'

মাধো বলে, 'এ-বাড়িটা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে। সব গুঁড়ো হয়ে যাবে। তুমি চলো, কাকা। এ-বাড়িটার ভিতে, ছাদে সব জায়গায় ডিনামাইট বসানো হচ্ছে। চলো, আমি তোমায় অসহায় অবস্থায় মরতে দেব না।'

কালি এবার উঠে দাঁড়ায়। মাধোর দিকে এগিয়ে আসে। তারপর মাধোর পায়ের সামনে বসে।

'আমাকে অসহায় বলে অপমান করিস না, বাপ। আমায় আমার মতো করে মৃত্যুকে বাছতে দে। এইটুকু সম্মান নিজেকে দে অন্তত। আমি পালাব না কারুর ভয়ে, বাঁচতেও চাই না নিজের ভয়ে। এটুকু সম্মান দে বাপ, তোর কাকাকে।...'

বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে কালির বেসুরো গলা, 'দীনকে দয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় না মৌলা, দীন কে দয়া।'

কালির বাড়ির বাইরে জনসমুদ্র। কিন্তু নিশ্চল সবাই অপেক্ষা করছে মাধোর নির্দেশের। এবার দেখা গেল মাধো বাড়ির ছাদে এসে দাঁড়িয়েছে। জনসমুদ্র গর্জন করে উঠল। মাধো ইঙ্গিত করার অনেক আগে আনন্দে উৎসাহে এবং মদে উত্তেজিত শঙ্কু ডিনামাইটের সলতেগুলোতে আগুন দিয়ে ফেলেছে। সেটা কেউ খেয়াল করেনি।

মাধো শান্তভাবে ছাদে দাঁড়িয়ে জনগণকে শান্ত করছিল। হঠাৎই সবার চোখে পড়ে সলতের আগুনগুলো দ্রুতগতিতে ডিনামাইটগুলোর দিকে ছুটে যাচ্ছে।

সবাই চিৎকার করে ওঠে! বাড়িটার সঙ্গে মাধোও তো উড়ে যাবে।

মাধো যখন বিষয়টা বুঝতে পারল, আগুন তখন তার পায়ের তলায়। সে লাফিয়ে ওঠে। সে লাফাতে থাকে। তার পায়ের সঙ্গে আগুনের লুকোচুরি চলতে থাকে।

রাস্তার ভিড়ের মধ্যে থেকে গবাপাগলা চিৎকার করে ওঠে, 'বেটা আমার কালির মাথায় নাইচছে বটে।'

তার কথা শেষ হতে হতেই মাধো লাফ দিয়ে সামনের পুকুরটায় পড়ে। প্রচণ্ড শব্দে ডিনামাইটগুলো ফাটে। তাসের ঘরের মতো বাড়িটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। প্রকাণ্ড একটা ধুলোর মেঘ দেখা দেয়—যা জনসমুদ্রকে বাকহীন করে তোলে। শুধু শোনা যায় পাখিদের ভয়ার্ত চিৎকার। মানুষেরা কথা বলতে ভুলে গেছে, থেমে গেছে মানুষের চোখের পলক, তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস, থেমে গেছে কালির বেসুরো গান, 'দীনকে দয়া হয় না মৌলা, দীনকে দয়া।'

সুতপা জানতে চায়, 'তারপর?'

আসলে বেশ কয়েক দিন মানে প্রায় দু-মাস পরে সে সুধাকরের কাছে, মানে ডি.এম. বাংলোয় ফিরেছে। সুতপা গিয়েছিল ওর বাপের বাড়ি। এখানকার হালফিল রিপোর্টটা ওর জানা হয়নি। খাওয়াদাওয়ার পর বারান্দায় বসে ওরা দুজন গালগল্প করছিল।

সুধাকর বলে, 'তারপর আর কী, তোমার হিরো তো ভোটে দাঁড়াচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানে, দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছে। না দাঁড়ালে খুন হয়ে যেতে পারে। রাজ্য সরকার তাদের এতবড় পরাজয় ভালো ভাবে নেয়নি। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার, মানে রাজ্যে যারা বিরোধী, তারা মাধোকে দাঁড় করাচ্ছে তাদের হয়ে। মানে, আমার কাকার মন্ত্রীত্বটা গেল। কারণ, এখানে মাধো দাঁড়ালেই জিতবে। কাকাকে কতবার করে বললাম, 'কালিকে ছেঁটে ফেলুন। শুনলেন না।'

সুতপা আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে, 'আমাদের হিরো ভোটে দাঁড়াবেই?'

সুধাকর বেজার মুখে বলে, 'শুধু দাঁড়াবেই না, জিতবেও এবং এম.পি. হবে, দিল্লি যাবে। তবে হ্যাঁ, এই জায়গাটার প্রচুর উন্নতি হবে। এখানকার গরিবগুরবো মানুষগুলোর জীবন বদলে যাবে, ভেড়িগুলোতে সোনা ফলবে। তোমার হিরো অন্যসব নেতাদের মতো চোর নয়। তার একটা আদর্শ আছে। প্রেমঘটিত বিষয় ছাড়া তার চরিত্রে কোনো দোষ নেই। সে সত্যিকারের একজন জননেতা। দুঃখ একটাই—ওইটুকু ছোকরাকেও এবার আমায় স্যালুট করতে হবে। মানে, সমীহ করে চলতে হবে।'

সুতপা বলে, 'আমি দেখেছি, আমাদের হিরোর কথা বলতে গেলেই তোমার চোখ সবসময় ওর প্রেমঘটিত দিকেই চলে যায়। এটা কেন? জানো তো এটাকে যৌন ঈর্ষা বলে!'

সুধাকর বলে, 'যৌন ঈর্ষা নয়, যৌন সন্দেহ বলে। ওই মহিলার স্বামীর মৃত্যুটা বেশ সন্দেহজনক।'

সুতপা বলে, 'কেন সন্দেহজনক কেন? সে তো আত্মহত্যা করেছে।'

সুধাকর বলে, 'যদি তাই হবে, তাহলে রিভলভারে স্বামীর হাতের কোনো চিহ্নই নেই কেন?'

সুতপা বলে, 'জনরোষের ফলে কেউ হয়তো মুছে দিয়েছে।'

কিছু না ভেবেই সুধাকর বিড়বিড় করে, 'হলেই ভালো, না হলেও কে দেখতে আসছে! তিরিশটা লাশ পড়েছে, সবই জনরোষের ঘাড়ে। ভালো ভালো। তবে ওই মহিলাটি অপরূপ সুন্দরী। তোমাদের হিরোর সঙ্গে মানাবে ভালো। যদিও মহিলা বয়েসে একটু বড়।'

সুতপা বিরক্ত হয়, 'তাতে তোমার কী? অন্য মহিলার প্রশংসা করছ, নিজের বউয়ের সামনে। তোমার মতলব কী বলো তো?'

সুধাকর হাসতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন স্টেশনে প্রচুর মানুষের সমাগম। গোটা গ্রাম প্রায় উপস্থিত। বলতে গেলে সবাই কাঁদছে। কিছু লোক কাঁদছে না, কারণ, তাদের অনেক দায়িত্ব। ট্রেনটা দাঁড়াবে পনেরো সেকেন্ড। তার মধ্যেই যাত্রীকে তুলে দিতে হবে। ট্রেন যাবে রাজধানী। যাত্রীও যাবে। দিল্লি থেকে কর্তাব্যক্তিরা এসে গেছেন। তারা এই অঞ্চলের সাংসদ, যিনি প্রচুর ভোটে জয়লাভ করেছেন, তাঁকে দিল্লি নিয়ে যাবেন। শপথ গ্রহণের জন্য।

ডি.এম. সুধাকরও এসেছেন, সঙ্গে তার স্ত্রী সুতপা। সে তার হিরোকে দেখতে এসেছে। সেই হিরো এবার গ্রামবাসীদের উদ্দেশে বলল, 'আমি কোথাও যাচ্ছি না। আমি তোমাদের মধ্যেই রইলাম। যেদিন আমার প্রয়োজন হবে, দেখবে, আমি তোমাদের পাশেই এসে দাঁড়িয়েছি। আমি ফিরে আসব।' শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে তার গলা ধরে যায়।

এই জনসমুদ্রের এক পাশে, একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে অনুরাধা। তার চোখ উজ্জ্বল। তার নায়ক আজ রাজধানী জয় করতে যাচ্ছে। আনন্দে তার মন ভরে আছে। না তার ভয় করছে না, দুঃখও হচ্ছে না। কারণ, আগের দিন জঙ্গলের মধ্যে তাদের সাক্ষাতের সময় মাধো তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'আমি শিগগির ফিরে আসছি। আমাদের সম্পর্কটা বৈধ বানাতে গেলে, তোকে স্বনির্ভর হতে হবে, অনু। তুই আবার পড়াশুনোটা শুরু কর। তোর পরিচয়, তুই ঘোষবাবুর বিধবা নয়, তোর পরিচয় হবে তুই অনুরাধা। তখন আমাদের সম্পর্কটা বৈধ হবে। সবাই দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করবে। সবাই মেনে নেবে। আমাদের ভালোবাসবে। আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারব অনুরাধা আমার।'

আনন্দে কেঁদে ফেলেছিল অনু। ভিজিয়ে দিয়েছিল মাধোর বুক। তাই আজ সে কাঁদছে না।

মাধো ট্রেনে উঠে যায়। এ যাত্রায় তার সঙ্গে যাচ্ছে তার পুরোনো সঙ্গী শঙ্কু। ট্রেনটা দুলে ওঠে। সবাই জয়ধ্বনি দেয়। মাধোর চোখ ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ে গাছতলাতে। সেখানে অনু দাঁড়িয়ে। অনুর চোখে চোখ পড়ে। মাধোর একটা হাতের আঙুল উঠে যায় তার কপালে। তারপর সেই আঙুলটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুর দিকে তুলে ধরে। এরপর সেই হাতটাই ঠেকায় নিজের বুকের বাঁদিকে। এবার অনুর ভয় ধরে। মাধো কী বলতে চাইছে? 'তোকে দুশ্চিন্তার রেখা করেই নিয়ে গেলাম।' তার মানে? তার কাছে মাধো আর ফিরবে না?

ট্রেনটা চলতে শুরু করে। একসময় স্টেশন ছাড়িয়ে চলে যায়।

এতটা বলে স্টেশনমাস্টার থামলেন। রাত বাড়ছে, বাইরে ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। আর আমি অমলেন্দু ঘটক, মানে, তোদের নর্থ ক্যালকাটার ঘটা, বেবাক হয়ে বসে রইলাম।

একসময় বললাম, 'তারপর?'

স্টেশনমাস্টার বলেন, 'তারপর আর কী, সে দিল্লি চলে গিয়ে এ অঞ্চলের প্রচুর উন্নতি করল, গ্রামবাসীদের গড় আয় একশো গুণ বেড়ে গেল, ভেড়িগুলো কো-অপারেটিভ বানাল, কলেজ বানাল, স্কুল বানাল, চিকিৎসাকেন্দ্র বানাল—সব মিলিয়ে ফাটিয়ে দিল। কিন্তু নিজে একবারও এল না বাইশ বছরে।'

স্টেশনমাস্টারকে এবার আমি প্রশ্ন করলাম, 'এ লোকটা দিল্লির কোন্ নেতা?'

মাস্টার একটু হেসে বললেন, 'মিড ফার্নান্ডেজ।'

আমি অবাক, চমকে উঠলাম, 'মাধোই মিড ফার্নান্ডেজ! যে কিনা মুকুটহীন রাজা। আমাদের দেশের রাজনীতিতে রাজধানীতে যে দলই আসুক না কেন, সবাই তাকে নিজের দলে চায়। সে এতটাই দক্ষ রাজনীতিবিদ। তার বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোনো কোরাপশনের দাগ লাগেনি। সে চাইলে বলে বলে সরকার গড়ে, বলে বলে সরকার ভাঙে। অথচ সে অত্যন্ত লো প্রোফাইলে থাকা একজন মানুষ।'

পরেরদিন হাট সেরে স্টেশনে ফিরে দেখলাম নীল শাড়ি পরে অনুরাধা দেবী বসে আছেন তার নিজের জায়গায়। ট্রেন আসতে তখনো মিনিট দশেকের দেরি। আমি এগিয়ে গেলাম পায়ে পায়ে। গিয়ে নমস্কার করলাম। উনিও প্রতি নমস্কার করলেন, কিন্তু চোখ দুটোয় স্থিরতা।

আমি বললাম, 'আমি আপনার সম্পর্কে শুনলাম। মানে, আপনাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামের অভ্যুত্থানের কথা আর কি।'

ভদ্রমহিলা ম্লান হেসে বললেন, 'ও, ওই স্টেশনমাস্টারবাবু বোধহয় বলেছেন? ওঁরা সবটা জানেন না। জানা উচিতও নয়। এ সবটাই আমাদের অঞ্চলের কথা। মন্ত্রগুপ্তি বলতে পারেন। আমরা বাইরের লোকদের সঙ্গে শেয়ার করি না।'

আমি আর না পেরে বলে উঠি, 'আপনার কী মনে হয়? উনি কি ফিরে আসবেন?'

মহিলা আমায় বললেন, 'আপনার কী মনে হয়?'

আমি ইতস্তত করি ঃ 'মনে হয়, না।'

মহিলা ট্রেন লাইনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আমারও তাই মনে হয়। ওর পক্ষে সবকিছু ছেড়ে আসা সম্ভব নয়। তাতে ও খুন হয়ে যেতে পারে।'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'তবে যখন জানেন, উনি আর ফিরবেন না তাহলে কেন রোজ এভাবে অপেক্ষা করেন?'

ততক্ষণে ট্রেনটা এসে চলেও গেছে। প্ল্যাটফর্মে কিছু উড়ো ধুলো।

ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ান। তারপর আকাশের দিকে তাকান। বলেন, 'কেন? কেন অপেক্ষা করি? আসলে আমার মনে হয়, ওর যেমন পথ চলতেই আনন্দ, আমার তেমন পথ চাওয়াতেই আনন্দ।'

আমি বোকার মতো ভদ্রমহিলাকে মাঠের মধ্যে নীলবিন্দুতে পরিণত হতে দেখলাম।

পরের দিন কলকাতায় ফিরে এলাম।...

ঘটাদা চুপ করলেন। আমরাও মোরামের প্ল্যাটফর্ম থেকে আমাদের হাউজিং এস্টেটের মাঠটাতে ফিরলাম।

আমরা সবাই চুপ। রাজাই স্তব্ধতা ভেঙে বলল, 'ঘটাদার গল্পটা কেমন চেনা চেনা লাগছে।'

ঘটাদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'চেনা তো লাগবেই। ছোটবেলা থেকে তো এ গল্প ঠাকুমা-পিসিমার মুখে বহুবার নিশ্চয়ই শুনেছিস। অবশ্য অন্য ফর্মে।'

রাজা বলে, 'গল্পটা একটু ধরিয়ে দাও।'

ঘটাদা মিচকি মিচকি হাসে, 'আগে নামগুলোকে অ্যানালিসিস কর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা বলে, 'মাধো।'

ঘটাদা বলে, 'মাধব, শতনামের একটা নাম।'

রাজা বলে, 'কলিমুদ্দিন সামস্।'

ঘটাদা বলেন, 'কালীয়।'

রাজা বলে, 'শঙ্কু।'

ঘটাদা বলেন, 'সঙ্কর্ষণ, মানে বলরাম।'

রাজা বলে, 'ঘোষবাবু।'

ঘটাদা বলেন, 'আয়ান ঘোষ।'

ঘটাদা তারপর বিরক্ত হয়ে বলেন, 'এবার দয়া করে জানতে চাইবি না কে অনুরাধা। বেন্দাই গ্রামটা কি বৃন্দাবন? আসলে একটু আগে তোরা বলছিলি না, মাইকে অর্থহীন চিৎকার হচ্ছে। আসলে তখন 'কালীয় বধ' উপাখ্যানটা ব্যাখ্যা হচ্ছিল। আমি সেটাই তোদের বোঝার মতো করে মডার্ন ফর্মে শোনালাম। সরলীকরণ বলতে পারিস। আসলে কালীয় বধের সে অলৌকিক তত্ত্ব, যেটা তোদের যুক্তিবাদী মন গ্রহণ করতে ইতস্তত করে—আমি সেটা বাদ দিয়েই উপাখ্যানটা শোনালাম। কী রে, এবার অর্থহীন মনে হচ্ছে? না, এবার যাই, বাচ্চাটার বেবিফুড কিনতে হবে। দোকানটা বন্ধ হয়ে যাবে।'

ঘটাদা উঠে মাঠের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। আমরা হতবাক হয়ে বসে রইলাম। আমাদের সবার মন পড়ে আছে তখন মোরাম বিছানো একটা প্ল্যাটফর্মে। যেখানে এইমাত্র একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল। পনেরো সেকেন্ডের জন্য। আর আমরা যেন দেখতে পাচ্ছি, একটা লোক একটা ধূসর হ্যাভারস্যাক নিয়ে ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নামছে। এবার তার আসার সময় হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো ডাকাত দেখিনি। শুনেছি, ডাকাতদের বেশ গাট্টাগোট্টা
ারা হয়। পেল্লায় গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল হয়। এ সবই শোনা কথা। নিজের চোখে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, যার ওপর ডাকাতি হয়েছে, তেমন মানুষ দেখেছি।

সালটা ১৯৮৫ বা ৮৬। আমরা তখন সদ্য যুবক। দুনিয়া দেখছি নতুন চোখে। কিছুই জানি না। এদিকে কিছুই বুঝি না, কিন্তু ভাবটা এমন যেন জ্ঞানের শেষ কথা কণ্ঠস্থ। পাড়ায় বসে গুলতানি আর পাড়ার পার্টির দাদাদের নির্দেশে মিটিং মিছিলে যাওয়া। জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ বলে চিৎকার। কে বা কী জিন্দা থাকবে, এসব বোঝা বা ভাবাটা আমাদের কাজ নয়।

কখনো যুদ্ধ নয় শান্তি চাই বলে মিছিল করা। তাতে পৃথিবীতে কোথাও শান্তি এসেছিল বলে জানা যায়নি, বা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত ভেঙে দাও বলে চিৎকার করায় মার্কিনিদের কোনো অসুবিধা হয়েছিল বলেও জানা যায়নি। কিন্তু আমরা বেশ ছিলাম। এক কথায় বিন্দাস।

আমরা থাকতাম হাউসিং এস্টেটে। মানুষের চিড়িয়াখানা বলাই ভালো। এমতাবস্থায় একদিন পাড়ায় পুলিশ এল। একজন চোর আমার পাড়ায় নাকি অনেকদিন ধরে আত্মগোপন করে আছে। জানা গেল চোর নাকি রেবা ঠাকুমার ফ্ল্যাটে এতদিন ছিল। রেবা ঠাকুমাই নাকি তাকে তার ফ্ল্যাটে প্রায় মাস ছয়েক ধরে লুকিয়ে রেখেছিল।

পুলিশ এসে ফটিক নামের চোরকে গ্রেফতার করল। ফটিকের জেল হল। সে নাকি কারখানার ক্যাশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা সরিয়েছে। সে টাকা ফেরত পাওয়া গেল না। ফটিক নাকি তার মায়ের চিকিৎসায় সব টাকা খরচ করে ফেলেছে। সাতদিন আগে মা-ও গত হয়েছেন। নগেনদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব রাগ গিয়ে পড়ল বৃদ্ধ রেবা ঠাকুমার ওপর।

নগেনদা ছিলেন পার্টির একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং পার্টির বিষদৃষ্টি গিয়ে পড়ল রেবা ঠাকুমার ওপর। কয়েকজনের ধারণা হল ফটিক তার চুরির একটা হিস্সা ঠাকুমাকে দিয়ে গেছে।

ঠাকুমার তিনকুলে কেউ নেই। বছর পাঁচেক হল বাড়ি থেকেও বেরোতে পারেন না। চোখেও ভালো দেখেন না। অর্থকষ্টও প্রবল। আমাদের বাবাদের কাছে শুনেছিলাম, রেবা ঠাকুমা নাকি একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। বহুবার জেল খেটেছেন। দল যখন আন্ডারগ্রাউন্ডে, তখন নাকি ফুটপাথেও থেকেছেন। কিন্তু আমাদের জ্ঞান হওয়া থেকেই ওনাকে একা একা থাকতেই দেখেছি। খুব একটা কারুর সঙ্গে মিশতেন না, কথাও বলতেন না। তারপর এক সময় ওঁকে বুড়ো হতে দেখলাম। পরিশেষে ওঁকে অথর্ব হতেও দেখলাম।

আমাকেই দায়িত্বটা দেওয়া হল অথর্ব মানুষটাকে পার্টি অফিসে হাজির করার। আমি হাজির হলাম ঠাকুমাকে নিয়ে। চার-পাঁচ জন বসেছিল লোকাল কমিটির, জোনাল কমিটির। ঠাকুমাকে দেখে সবাই কথা থামাল।

হঠাৎ-ই আমাদের অঞ্চলে বর্ষীয়ান নেতা সত্যেন ব্যানার্জি অফিসে ঢুকলেন। সবাই উঠে দাঁড়াল। সত্যেনবাবু বিরাট নেতা। উনি সবাইকে বসতে বলে নিজে বসলেন। বললেন, 'গাড়ির টায়ারটা গেছে। তাই একটু বসতে এলাম।'

সবাই হা-হা করে উঠল। যেন ধন্য হয়ে গেছে।

সত্যেনবাবু হঠাৎ-ই ঠাকুমাকে দেখে বললেন, 'আরে, রেবাদি না! আপনি এখনো বেঁচে আছেন?'

তারপর সবাইকে আসার কারণ জানতে চাওয়ায়, সবাই বিষয়টা ওঁকে জানায়। শুনে সত্যেনবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'রেবাদি। আপনার মতো একজন মানুষ কী করে একটা চোরকে আশ্রয় দিলেন, ভেবে পাচ্ছি না!'

ঠাকুমা শক্ত গলায় বলে উঠলেন, 'আমার ছেলেটাকে ভালো লেগেছিল।'

'কী করে ভালো লাগল একটা চোরকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কারণ ও চুরি করেছিল মায়ের চিকিৎসার জন্য। আজকের দিনে এমন ছেলে বিরল।'

সত্যেনবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন, 'কিন্তু, চুরিটা তো চুরিই।'

ঠাকুমা বললেন, 'কীসের চুরি? ও তো ওর প্রাপ্য টাকাটাই নিয়েছে। ওর মালিক দু-বছর ধরে দিচ্ছিল না। আর তোমরাই তো একদিন বলতে, লাঙ্গল যার জমি তার। হাত যার মেশিন তার। ও ওর অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। ও চাইলে আরও টাকা নিতে পারত। কিন্তু নিজের প্রাপ্যটুকুই শুধু নিয়েছে। এ ছেলেকে তো আমি বিপ্লবী বলব। তার মধ্যে আদর্শ আছে, মায়া আছে, মমতা আছে। সে আমার মতো একজন অথর্ব বুড়িকেও মাতৃজ্ঞানে সেবা করেছে, যত্ন করেছে। সত্যেন তুমি তো আমার কমরেড, তোমায় বাঁচাতে আমি জেলে গেছি! আর আজ তুমি আমায় জিগ্যেস করছ, রেবাদি আপনি বেঁচে আছেন?'

সত্যেনবাবু বাকি সবার দিকে তাকিয়ে হাসেন। ভাবটা এমন যে বৃদ্ধার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। লোকাল কমিটির একজন বলে, 'কিন্তু এলাকার পরিবেশে একটা প্রতিক্রিয়া হল।'

রেবা ঠাকুমা বলে ওঠেন, 'একজন বুড়ি যে কিনা অথর্ব, সে কেমন আছে, সে বিষয়ে উদাসীন থাকায় পরিবেশে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না, তাই তো? তোমরা তো মানুষের রাজনীতি করো। তা মানুষকে কি মানুষ ভাবো না?'

সত্যেনবাবু এবার হেসে বললেন, 'রেবাদি, আপনি কিন্তু বিষয়টা ব্যক্তিগত ভাবে নিচ্ছেন।'

ঠাকুমা বললেন, 'পৃথিবীতে সবটাই ব্যক্তিগত। ব্যক্তি যা গ্রহণ করে, সেটাই নীতি, সেটাই আদর্শ। ব্যক্তি ছাড়া সমষ্টি তৈরি হয় না। তোমায় বাঁচাতে আমি জেলে গিয়েছিলাম। তা আমার ব্যক্তিসত্ত্বার ক্ষতি। তুমি এখন গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াও। সেটা তোমার ব্যক্তিসত্ত্বার লাভ।'

সত্যেনবাবু উত্তেজিত হলেন, 'আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছি। আমার প্রচুর কাজ থাকে।'

ঠাকুমা বললেন, 'একজন রিকশাওয়ালাও নিজের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবে। সে গাড়ি করে ঘোরার সুযোগটা পায় না, এসি ঘরে থাকার সুবিধে পায় না। আর তোমরা তো ওদের কথাই বলো, তাই না?'

সত্যেনবাবু কথা খুঁজে পান না। একটা সিগারেট ধরান।

লোকাল কমিটির একজন বললেন, 'সমাজে আপনার কনট্রিবিউশন কী? আপনি কী করেছেন?'

ঠাকুমা একটা বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন, 'জিগ্যেস করো তোমার নেতাকে! আমাদের আত্মত্যাগ না থাকলে, তোমাদের মতো মানুষরা এখানে বসে দেশোদ্ধার করতে পারতে না।'

সত্যেনবাবু ঘামতে শুরু করেছেন। ঠাকুমা তখনও বলে চলেছেন, 'কী করিনি তোমাদের জন্যে? পার্টি করতাম বলে বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। ভালো ছাত্রী ছিলাম। ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারলাম না। জেল হল। একটা জুটমিলে চাকরি করতাম। তোমাদের লক-আউটে চাকরি গেল। জীবনে বিয়ে করলাম না, পাছে পার্টির কাজে ক্ষতি হয়। আমি তো কোনো পরিবারই রাখতে পারলাম না পার্টির জন্য।

'সবাই দেখি আমার বয়েসে ধর্মকর্ম করে, আশ্রমে যায়, ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার অবলম্বন হিসেবে। সেটাও তোমাদের দিয়ে দিয়েছি। শিখিয়েছ, আমিও শিখেছি, ঈশ্বর নেই। মেনে নিয়েছি। এর পরও জানতে চাও, আমি কী কী দিয়েছি?'

সত্যেনবাবু বললেন, 'ধর্ম আসলে আফিং।'

ঠাকুমা বললেন, 'তোমাদের ইস্তেহার তো শ্রমজীবী মানুষের ইস্তেহার। কিন্তু যারা শ্রমজীবী নয় বা শ্রমে অক্ষম, তাদের কি বাঁচার অধিকার নেই? তাদের কি গ্যাস চেম্বারে পুরে দেবে?'

হঠাৎ সবাই কেমন ব্যস্ত হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে অন্য বিষয়ে কথা শুরু করল। সত্যেনবাবু উঠে চলে গেলেন। অন্য একজন আমায় বলল, ঠাকুমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে।

আমি ঠাকুমাকে নিয়ে হাউজিং-এ এলাম। বাড়ি নিয়ে যেতে চাওয়ায়, ঠাকুমা বললেন, 'তিনি একটু রাস্তার পাশের বেঞ্চিটায় বসতে চান।' ঠাকুমা বেঞ্চিটাতে ক্লান্ত ভাবে বসলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এগিয়ে গেলাম আমাদের আড্ডার দিকে। হঠাৎ-ই পেছন ফিরে একবার ঠাকুমাকে দেখলাম। দেখলাম, ঠাকুমা একই ভাবে বসে আছেন।

আমি কখনো ডাকাত দেখিনি। কিন্তু ঠাকুমাকে দেখলাম, যার শেষ পারানির কড়ি—ঈশ্বর বিশ্বাসটাও ডাকাতি করে নিয়ে গেছে আদর্শ নামের এক ডাকাত!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকার রক। পাত্রপাত্রী চারজন—আমি, অনিন্দ্য, রাজা ও চন্দন।

ই অফিস থেকে ফিরে স্নানটান করে সন্ধেবেলা আমাদের [illegible] মাঠের মাঝখানে নিজেদের বানানো কাঠের রকে বা বেঞ্চটায় অধিষ্ঠিত হয়ে গুলতানি করছিলাম। আজকের আলোচনা—খবরের কাগজ। আজকের কাগজে একটি বড় খবর, একটি কুকুর নাকি বারোটা বাচ্চা দিয়েছে। এটা একটা খবর!

চন্দন বলছে, 'সত্যি মাইরি, কোন মন্ত্রী হেসেছেন, কোন মন্ত্রী কোনোদিন হাসেননি, এ খবরও আমাদের পড়তে হবে? আমাদের এরা ভাবে কী?'

রাজা বলে, 'কী আর ভাবে, গাধা ভাবে। আসলে আমাদেরও তো কিছু করার নেই। যা খাওয়াবে তাই খাব।'

অনিন্দ্য বলে, 'আসলে খবরই নেই। পাতা ভরানোর জন্য যা পারে লেখে।'

আমি বলি, 'তা বলে এই সব গুরুত্বহীন খবর ছাপবে? দেশে কি কোনো খবর নেই?'

'কোনটা গুরুত্বহীন?' অন্ধকারে একটা গলা শোনা গেল। আমরা মুখ তুলে দেখি, ছায়া ভেদ করে ঘটাদার উদয় হয়েছে।

ঘাসের মধ্যে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়লেন আমাদের সামনে। তারপর যথারীতি আমার থেকে একটা সিগারেট চাইলেন।

'কোনটা গুরুত্বহীন?'

আমি বললাম, 'একটা কুকুর বারোটা বাচ্চা দিয়েছে। আজ কাগজের হেডলাইন।'

ঘটাদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'দ্যাখ, এই জন্যেই আবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ না বেধে যায়।' আমরা হতবাক। এ-ওর মুখের দিকে তাকাই। ঘটাদার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে সিগারেটে টান

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিচ্ছেন।

রাজা মুখ খোলে, 'এসব আঁতলামির মানে কী? এ কি আধুনিক কবিতা নাকি? ম্যাডাগাস্কায় মুদ্রাস্ফিতি, তাই ক্যাটাগাস্কায় মৌন বিপ্লব।'

ঘটাদা নির্বিকার। খালি বললেন, 'প্রজাপতি!'

আমরা আরও বিরক্ত। আমিই শেষে বললাম, 'কী বলতে চাইছ ঘটাদা, খুলে বলো।'

ঘটাদা এবার সোজা হয়ে বসলেন। মাঠের ওপাশের ল্যাম্পপোস্টের আলোটা দুলছে। মনে হচ্ছে আমরা একটা জাহাজে বসে আছি। জাহাজটা অন্ধকার সমুদ্রে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

ঘটাদা বলেন, 'বাটার ফ্লাই এফেক্ট বলে একটা বিষয় আছে, জানিস কী? একদল বিজ্ঞানী বলেন যে, একটা প্রজাপতির ডানা ঝাপটানিতে সুনামি আসতে পারে। এটা একটা জটিল অঙ্কশাস্ত্র, এটাকে ক্যাওস থিওরিও বলে।'

আমরা সবাই চুপ।

'যেমন ধর, অসীমবাবুর সাদা পাঞ্জাবিতে চা পড়ল বলে ভূপালে ছেদিরামের ফাঁসির দণ্ড মকুব হয়ে গেল।'

আমরা কথা খুঁজে পাচ্ছি না। একসময় ঘটাদার ঘোর বিরোধী রাজাই বলল, 'নে—এবার একটা উল্টুস ধুল্টুস গল্প ফাঁদবে।'

ঘটাদা চুপ করে বসেছিলেন। যেন জানতেন, পৃথিবী আবার শান্ত হবে। একসময় আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার শুরু করি?'

আমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ।'

'অসীমবাবু একজন সরকারি কর্মচারী। বছর দুয়েক বাদে অবসর নেবেন। খুবই শৌখিন লোক। টিপটপ থাকতে ভালোবাসেন। সেদিন সকালে উনি বিপদে পড়েছেন। আগের দিন ওনার বউ রাগ করে বোনের বাড়ি চলে গেছেন। ছেলে, ছেলের বউ থাকে দিল্লিতে। বাড়ির কাজের বউটাও আসেনি। অথচ অফিসে পৌঁছতে হবে টাইমে। ব্রেকফাস্টটা সেরে নেবেন বিজনের চায়ের কেবিনে। লাঞ্চটা অফিসের ক্যানটিনে।

কেবিনে বসে ব্রেকফাস্টে ওমলেট আর টোস্ট খেলেন। অবশেষে চা খাবেন এবং অফিস যাবেন ভেবে চায়ের আশায় বসে ছিলেন। চা এল, কিন্তু চায়ের কাপটা তুলতে গিয়ে কাপের হাতল হঠাৎ-ই খুলে গেল। এবং পুরো চা-টাই সাদা পাঞ্জাবিতে পড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবিনের মালিক ছুটে এল, কাপড়-টাপড় দিয়ে চা-টা মোছা হল। কিন্তু একটা বেঢপ দাগ থেকে গেল। বাড়ি ফেরার কোনো চান্স নেই পাঞ্জাবি বদলের জন্যে। অফিসে ঢুকতে দেরি হয়ে যাবে। কী আর করা যাবে, বিশ্রি একটা দাগ নিয়ে অসীমবাবু ব্যাজার মুখে অফিসের পথে এগোলেন।

অফিসে গিয়ে জানতে পারলেন, এক নতুন অফিসার বড়কর্তা হয়ে আজ জয়েন করেছেন। অফিসার অল্প বয়স্ক এক ছোকরা। অফিসের সবাইকে ডাকা হয়েছে, পরিচয়ের জন্যে। অফিসার সবার উদ্দেশ্যে কথা বলতে বলতে হঠাৎ তার চোখ গিয়ে পড়ল অসীমবাবুর দিকে। তার কথা থেমে গেল। বিরক্তি সহকারে বলেন, 'আপনি কি অফিসটাকে পাড়ার ক্লাব মনে করেন? এটা যদি বিদেশ হত তাহলে ড্রেস কোডের কারণে এতক্ষণে আপনার চাকরি যেত।'

একথা শুনে সবাই অসীমবাবুর দিকে এমনভাবে তাকাতে থাকল যেন অসীমবাবু একটা পোকা! ঘৃণ্য। অসীমবাবু নিজের কেবিনে ঢুকে পাঞ্জাবিটা খুলে গেঞ্জি পরে বসে রইলেন। তারপর হাঁক দিলেন—নিবারণ।

নিবারণ এখানকার পিওন। নিবারণকে কিছু টাকা দিয়ে চা-লাগা পাঞ্জাবিটা দিয়ে বললেন, 'এই সাইজের একটা পাঞ্জাবি সামনের দোকান থেকে কিনে আন।'

এত বছরের চাকরিতে এত বেইজ্জত উনি কখনো হননি।

নিবারণ এখন অসীমবাবুর পাঞ্জাবিটা ঘাড়ে ফেলে গুনগুন করে গাইতে গাইতে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের পাঞ্জাবি প্যালেসের দিকে। ফুটপাথে খুব বেশি লোক নেই। কেউ খেয়াল করল না, নিবারণের কাঁধে ঝোলানো পাঞ্জাবিটার বুকপকেট থেকে একটা ভাঁজ করা ছোট্ট কাগজ ফুটপাথের ওপর পড়ে গেল। হাওয়ায় উড়তে উড়তে সেটা এগিয়ে গেল কংক্রিটের রাস্তা ধরে।

গুরুপদর গ্যারেজে ভূতনাথ একটা বালতির মধ্যে একটা গাড়ির টায়ার ডুবিয়ে চোরা ফুটোটাকে খুঁজছিল। গ্যারেজ খুব একটা চলে না। তবে গুরুপদ মানুষ ভালো। মানুষ ঠকাতে জানে না।

ভূতনাথ এসেছিল মেদিনীপুরের বৈকুণ্ঠতলা গ্রাম থেকে। বুড়ি মা মারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবার পর তার কাকারা তাকে খেদিয়ে দিল। গুরুপদ তাকে তিন বছর এই গ্যারেজেই থাকতে দিয়েছিল। হাতে ধরে কাজও শিখিয়েছিল। এখন তার একুশ বছর বয়স। বালতির দিকে চোখ থাকায় প্রথমে সে দেখতে পায়নি। তারপর হঠাৎ দেখল প্রজাপতির মতো একটা ভাঁজ করা ছোট্ট কাগজ তার পায়ের কাছে চক্কর কাটছে।

ভূতনাথ তো আর জানে না, এ কাগজ প্রতি মাসে সনৎ নামের একজন লোক অসীমবাবুদের অফিসে এসে নানা ফিকিরে কর্মচারীদের বিক্রি করে যায়। কেউ কেনে, কেউ কেনে না। এমাসে একদিন আগে প্রচুর অনিচ্ছা নিয়ে অসীমবাবু কিনেছিলেন, তারপর ভুলেও গেছিলেন। পকেটের কোনায় নিবারণের কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় অসহায় পাঞ্জাবির পকেট থেকে কাগজটা মুক্ত হয়ে ডানা মেলে উড়তে উড়তে এখন ভূতনাথের পায়ে।

গুরুপদ খাটিয়ায় বসে চা খাচ্ছিলেন। কাগজটা দেখে বললেন, 'এটা কবে কিনলি রে ভূতো?'

ভূতনাথ বলে, 'কিনিনি। গ্যারেজের মাটিতে পেলাম।'

গুরুপদ বললেন, 'এ তো লটারির টিকিট। কাঞ্চনজঙ্ঘা লটারি।'

ভূতনাথ বলে, এটা নিয়ে এখন কী করি? ফেলে দেব?'

গুরুপদ বললেন, 'না, না। ফেলিসনে। ক'দিন বাদেই এর ফলাফল। দ্যাখ, তোর কপাল খোলে কি না।'

ভূতনাথ হাতের পাতায় রাখা টিকিটটার দিকে তাকিয়ে থাকে। টিকিটটা যেন হাসছে।

আজ ভূতনাথের কোনো কাজ নেই। তার ছোট দোকানটার সামনে একটা বেঞ্চে বসে আছে। সে এখন বৈকুণ্ঠপুরে ফিরে এসেছে। একটা সাইকেল মেরামতের দোকান দিয়েছে। কাকারা এখন কিছু বলে না। সে বাড়িতেই থাকে। মাসে মাসে একটা টাকা ধার দেওয়ার রফা হয়েছে। লটারির টিকিটটা হেসে হেসে তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইয়ে দিয়েছে।

সে বসে বসে ল্যাদ খাচ্ছিল। হঠাৎ-ই চোখ গেল দূরের রাস্তাটার দিকে। একটা লোক পায়ে হেঁটে একটা সাইকেল হিঁচড়ে নিয়ে আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাক, একটা কাস্টমার পাওয়া গেল। একটু কাছে আসতেই লোকটাকে চেনা গেল। চরণদাস।

ভূতনাথ একটু নিরাশ হল। এ কাস্টমার পয়সা দেবে কিনা সন্দেহ। চরণদাস পেশায় চোর। বয়েস মধ্য পঞ্চাশ। চরণদাস দোকানের সামনের জায়গাটায় এসে করুণভাবে হাসল, 'বাবা। সাইকেলটা একটু সারিয়ে দে। চাকাটায় মনে হয় ছ্যাঁদা হয়ে গেছে।'

ভূতনাথ কঠোরগলায় বলল, 'দশ টাকা দিতে হবে কিন্তু।'

চরণদাস চোখ কপালে তুলে বলে, 'বলিস কী রে! এ যে দিনে ডাকাতি।'

ভূতনাথ বলে, 'সে তুমি যাই ভাবো, আমার রেট ওই।'

চরণদাস মনে মনে কী হিসেব করে। তারপর উদাস গলায় বলে, 'তাই দেব। যা দিনকাল পড়েছে!'

ভূতনাথ লেগে যায় কাজে। চাকাটা ফুটো হয়েছে। একসময় চাকার ফুটোয় পুলটিস লাগানো হয়ে যায়। চরণদাস তাকে টাকা দেয়। ভূতনাথকে বলে, 'একটু কমসম করলে পারতি রে বাপ।' ভূতনাথ জবাব দেয় না। বালতির জলে হাত ধোয়। চরণ সাইকেলে সওয়ার হতে হতে বলে, 'চলি রে ভূতো।'

ভূতনাথ কিছুই বলে না। মনে মনে হাসে, তোমায় আবার কাল আসতে হবে।

সাইকেলের চাকায় আরেকটা ফুটো হব-হব করছে। মাইল খানেকের মধ্যেই সে দেহ রাখবে। একথা সে চরণদাসকে বলেনি। এক ফুটোর দশ টাকা দিতেই তার এই দশা। দুটো ফুটোর কুড়ি টাকা দিতে তার প্রাণ যাবে। যাক, ব্যাটা ভুগুক। আবার কাল আসবে। আবার দশ টাকা। ভূতনাথ এবার বেঞ্চটায় শুয়ে পড়ে। আকাশের ছায়া পড়ে তার চোখে।

চরণদাস সাইকেল চালাচ্ছিল দ্রুত পায়ে। সামনের মোড়টা একটু তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে হবে। কারণ সামনেই থানা। যদিও ইদানীং তার বিরুদ্ধে কোনো চার্জ নেই, তবুও পুলিশে ছুঁলে আঠেরো ঘা। বিপদটা তখনই হল। চাকাটা ফাটল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থানার সামনে বটগাছটার নীচে কনস্টেবল কানাই বসে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। অসহায় চরণদাসকে দেখে সে মিটিমিটি হাসে। তারপর ইশারায় তাকে ডাকে। চরণদাস কিন্তু-কিন্তু করে সাইকেল নিয়ে তার সামনে দাঁড়ায়।

কানাই বলে, বোস। তোকেই খুঁজছিলাম। নে, একটা বিড়ি খা।

চরণদায় ভয়ে-ভয়ে গাছতলায় কানাইয়ের পাশে বসে। বিড়িটা ধরায় কাঁপা কাঁপা হাতে।

কানাই বলে, 'আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। যদি করিস তো ভালো, না করলে যদু স্যাকরার দোকানের চুরির কেসে তোকে গ্রেপ্তার করব। কমসেকম পাঁচ বছর ভেতরে থাকতে হবে।'

চরণ বলে, 'আমি তো সেই চুরি করিনি।'

কানাই বলে, 'জানি, জানি। সে কাজ অন্য লোকের। সে থানায় ভাগের টাকাও দিয়ে গেছে। কিন্তু চোর তো চাই। আমার কথা না শুনলে তোর নাম দিয়ে দেব। আর তুই ব্যাটা দাগি চোর। এবার বল কী করবি?'

চরণ এবার বলে, 'কী করতে হবে?'

কানাই উদাস গলায় বলে, 'আমার বউটা আর বাঁচবে না। মরণরোগ হয়েছে। অনেকদিন হল বিছানা নিয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে কেঁদেকেটে বায়না ধরেছে যে সে তার মায়ের হাতে পরা বালাটা পরতে চায়। সে বালা নাকি তার মায়ের মৃত্যুর পরে তার দাদা হাতিয়ে নিয়েছে। আমি তাকে কথা দিয়েছি সে বালা আমি এনে দেব। কিন্তু আমার সঙ্গে আমার বড় শালার সম্পর্ক ভালো নয়। মুখ দেখাদেখি নেই। আমি সে বালা ধার চাইলেও দেবে না। তার একটা সাধ আমি না রাখতে পারলে, নরকেও ঠাঁই হবে না রে। তাই তোর দারস্থ হলুম। তোকে সব সুলুক সন্ধান দিয়ে দিচ্ছি। তুই দু-একদিনের মধ্যে বালাটা হাতিয়ে এনে দে।'

চরণদাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কানাইয়ের মন ভালো নেই। কাল সকালে বউটা মারা গেছে। যদিও তার সাধ পূর্ণ হয়েছে। হাতে সে বালা পরেই গেছে। এখন সে বালা কানাইয়ের পকেটে। বালাটা বেশ ভারী। সে এখন যদু স্যাকরার দোকান থেকে ফিরছে। গেছিল বালাটা বেচতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদু বালাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে, 'এ তো পিতলের। এর দাম তো কানাকড়িও নয়।'

কানাই বেশ বড় ধাক্কা খেয়েছে। কী দিনকাল পড়েছে। কী ঠকান ঠকিয়েছে তার শাশুড়ি। তার এত ভাবনা, এত পরিকল্পনা, সব ধুলো হয়ে গেল। ছ্যা, ছ্যা। এখন কানাই একটা জঙ্গলের সামনে দাঁড়িয়ে। ওপারে একটা পুকুর। কানাই বালাটা বার করে ছুঁড়ে ফেলে দেয় পুকুরের দিকে।

তুলিরামের সময় ভালো যাচ্ছে না। তার পিতৃদত্ত নাম ক্ষুদিরাম। তবে সবাই তাকে তুলিরাম বলেই ডাকে। কারণ, সে একজন আঁকিয়ে। আগে সিনেমার পোস্টার-টোস্টার আঁকত। এখন সবই প্রিন্ট হয় বলে তার কাজ নেই। এখন সে পার্টির দেয়াল-টেয়াল লেখে, আঁকে। কোনোরকমে চলে। তুলিরাম পুকুরে নেমেছে।

একটা কাজ পেয়েছে তুলিরাম। শহর থেকে আসছে পার্টির বড় নেতা রাধামদন মিত্র। আর এখানের পঞ্চায়েতের হবু প্রার্থী প্রতাপ শেঠ মদনবাবুকে খুশি করার জন্য মদনবাবুরই একটি ছবি উপহার দেওয়ার মন করেছেন। একটি চারফুট বাই সাড়ে তিন ফুট ছবি। আর এ ছবি আঁকার দায়িত্ব পেয়েছে তুলিরাম। হাতে দুদিন সময় আছে। তুলিরাম পুকুরে স্নান করে উঠেই ছবিটা নিয়ে বসবে।

একটা ডুব দিয়েছে। দ্বিতীয় ডুব দিয়ে ওঠার সময় হঠাৎ-ই তার দু-চোখের মাঝখানে ঠকাস করে কী একটা ভারী জিনিস এসে পড়ল। তুলিরামের দু-চোখে অন্ধকার। একটা সময় নিজেকে আবিষ্কার করল পুকুরের ঘাটে সে শুয়ে আছে। তারপর কোনোরকমে ঘরে আসতে পেরেছে। আর একটা ব্যাপার সে আবিষ্কার করল যে, সে চোখে এখন দুটো করে জিনিস দেখছে।

প্রতাপ শেঠ বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না। লজ্জায় তার মাথা কাটা যাচ্ছে। সারা গ্রামে ঢি ঢি পড়ে গেছে। তাকে দেখে সবাই হাসছে। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। ভেবেছিল টিকিটটা সে বাগাবে। কিন্তু এ যা কাণ্ড হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে তো টিকিট পাওয়া অসম্ভব।

কলকাতা থেকে রাধামদন মিত্র আসছেন। তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। বিরাট স্টেজ বানানো হয়েছে। মদনদার সঙ্গে প্রতাপের বেশ ভাব। কলকাতার বাড়িতেও মাঝে মাঝে সে যায়। প্রতাপই মদনদাকে বহুকষ্টে তার গ্রামে আসতে রাজি করিয়েছিল। মিষ্টি, শাল, অন্যান্য উপহার এবং একটি আবক্ষ ছবি, যা তুলিরাম আঁকবে। ব্যবস্থা পাকা।

সকালে তুলিরামের ছেলে ভোলা এসে সুন্দর প্যাকেট করা ছবিটা দিয়ে গেল। বলল, বাবার শরীর খারাপ। বকেয়া ৫০০ টাকা নিয়েও গেল। প্রতাপ ভালো মানুষের মতো ছবিটা আর প্যাকিং খুলে দেখেনি। তুলিরামের হাত খুব ভালো এই বিশ্বাসে। কিন্তু সন্ধেবেলা তার বিশ্বাস ভাঙল।

মদনদা এলেন সন্ধেবেলা। স্টেজে উঠলেন। লোক গিজগিজ করছে চারপাশে। মদনদার মেজাজ ভালো ছিল না। পায়ের কড়াটা বড্ড জ্বালাচ্ছে। তবু টানা চল্লিশ মিনিট বক্তৃতা দিলেন। তারপর সম্বর্ধনা নিলেন।

সবশেষে ছবিটা হাতে নিয়ে প্যাকিংটা খুলে ছবিটা দেখলেন এবং প্রচণ্ড বিরক্তিতে লাল হয়ে গেলেন। ছবিটা জনগণও দেখে ফেলেছে। প্রতাপের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'এটা কি আমি, না কুমার শান্তনু?'

এই কথাটা মাইকে ক্যাচ করে নিয়েছে। জনগণ অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে। মদনদা আর না দাঁড়িয়ে গাড়িতে উঠে রওনা দিলেন। পেছনে পড়ে রইল ধুলো, প্রতাপের জন্য গ্রামবাসীর টিটকিরি এবং তার পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট পাওয়ার ব্যর্থ স্বপ্ন।

মোগলসরাই থেকে ট্রেনটায় উঠেছে ছেদিরাম। অবশ্যই বিনা টিকিটে। তার খাবার পয়সাও নেই। গত চারদিন সে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবেই ট্রেনে ট্রেনে ঘুরছে। সংসারে তার ঘেন্না ধরে গেছে। এখন সে এই ধ্যাড়ধ্যাড়ে ট্রেনটার মেঝেতে বসে।

বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে সে গৃহত্যাগী হয়েছে। এরকম প্রায়ই হয়। বউয়ের হাতে মার খেয়ে সে বহুবার ঘর ছেড়েছে। আবার ফিরেও গেছে। এবারও ফিরবে না ভেবেছিল। কিন্তু মনটা কেমন আবার ঘর ঘর করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাগল করছে। যদিও সে নিজেকে শক্ত করার নানা চেষ্টা করছে।

ট্রেনে তার একজন মানুষের সঙ্গে আলাপ হল। লোকটার নাম প্রতাপ। বাঙালি। ভাঙা ভাঙা হিন্দি বলে। তবে লোকটা দিলদরিয়া টাইপের। নিজের খাবারের ভাগ দিল। বলল, সে নাকি একজন এম. পি. রাধামদন মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি যাচ্ছে। কী সব ভুলটুলের ক্ষমা চাইতে। মানে ম্যানেজ করতে।

তার দুঃখের কথা শুনে লোকটা তাকে বলল, সে তো তাঁর সঙ্গে দিল্লি যেতে পারে। কয়েকদিন এক সঙ্গে থাকা যাবে। ছেদিরাম রাজি হয়ে যায়। বিবাগী মনটাকে দৃঢ় করে।

দুদিন পার হয়ে গেছে। প্রতাপের সঙ্গে রাধামদন মিত্রের দেখা হয়নি। সারাদিন প্রতাপ অপেক্ষা করেছে এম.পি. কোয়ার্টারের সামনে। মদনদাকে কিছুতেই ফাঁকা পাওয়া গেল না। ওরা কোন এক যদু স্যাকরার জামাইয়ের মেসে ছিল। ওই মেসে কেবল স্যাকরাই থাকে। কিন্তু ছেদিরামের কিছুই মনে নেই। সে ছিল অপ্রকৃতিস্থ।

এখন ওরা দিল্লি স্টেশনে দাঁড়িয়ে। প্রতাপ থাকবে। ছেদিরাম ফিরে যাবে ভূপাল।

প্রতাপ বলল, 'ভাইয়া কিছু খাওয়া যাক।'

ছেদিরাম সম্মতি জানায়। সামনেই শিঙাড়া-কচুরির দোকান। দোকানের মালিক খবরের কাগজ পড়ছিল। চারটে শিঙাড়া চাওয়ায়, মালিক দেখল শালপাতার প্লেট শেষ হয়ে গেছে। একটু বিরক্ত হয়েই সে হাতে ধরা খবরের কাগজের ভেতরের একটা পাতা ছিঁড়ে চারটে শিঙাড়া তাতে মুড়ে দেয়।

দুজনে শিঙাড়া খায়। এক সময় খাওয়া শেষ হলে কাগজটা ফেলতে গিয়ে দেখে, সামনে দিয়ে দুজন পুলিশ যাচ্ছে। ছেদিরাম তাই কাগজটা মুড়িয়ে পকেটে পুরে ফেলে।

ছেদিরাম একসময় ট্রেনে উঠে পড়ে। দুজন-দুজনকে হাত নাড়ে। দুজনেই জানে ওদের আর কোনোদিন দেখা হবে না। ট্রেনটায় প্রচুর ভিড়। মনে মনে সে নিজেকে আশ্বস্ত করে। এই ট্রেনে নিশ্চয়ই তার মতো কিছু যাত্রী আছে, যারা বিনাটিকিটে যাত্রা করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচারপতি ভগবতী মিশ্র ড্রইংরুমে বসে বসে টিভি দেখছেন। পূর্ববর্তী বিচারপতি বদল হয়েছেন। পূর্ববর্তী বিচারপতি রাজেশ বনশাল দিল্লি বদলি হয়েছেন। ওনার জায়গায় ভগবতী মিশ্র। বেশ কিছু কেস ঝুলে আছে। যার দায়িত্ব ভগবতী মিশ্রকে এবার নিতে হবে। একটা খুনের মামলাও আছে।

ভগবতী মিশ্র শুনেছেন আগের বিচারপতি এ মামলার রায় মোটামুটি ঠিক করেই রেখেছেন। একটা পার্টিতে দেখা হওয়ায়, ভগবতী মিশ্র আগের বিচারপতি রাজেশ বনশালকে মামলাটা সম্পর্কে জানতে চাওয়ায়, রাজেশ বনশাল হেসে বলেছিলেন, আরে ক্যায়া মিশ্রা সাহাব, লটকা দিজিয়ে।

ভগবতী মিশ্রর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেছিল। তিনি একটু নরম প্রকৃতির মানুষ। খুনের শাস্তি খুন, এটা তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি বনশালকে কিছু বললেন না। কিন্তু বাড়ি ফেরার সময় গাড়িতে তার সেক্রেটারি কমলকে বলছিলেন, খুনের শাস্তি খুন হতে পারে না। একটা সভ্য সমাজে এ রীতি চলতে পারে না। একটা মানুষ কোন পরিস্থিতিতে খুন করে? মানসিক ভারসাম্য হারিয়েই তো করে। আগুপিছু না ভেবে সবাই তো আর সিরিয়াল কিলার নয়। আর সিরিয়াল কিলারদেরও চিকিৎসা করা যায়। আর আমরা একটা ঠান্ডা ঘরে বসে সুস্থ শরীরে, ঠান্ডা মাথায় একজন মানুষকে মৃত্যুর অর্ডার দেব? আমাদের সঙ্গে ওই খুনিটার কী তফাত? আমরা তো সভ্য সমাজের কাছে আরও বিপজ্জনক।

কমল জানে, ইদানীং আইনকানুন ব্যবস্থা সম্পর্কে তার স্যারের একটু কনফিউশন দেখা দিয়েছে। ব্যাপারটা আর কিছুই না। ভগবতীবাবুর ছেলে রজত এবং তার বউ লীলার মধ্যে অশান্তি চরমে। লীলা বড়লোকের মেয়ে। স্বাধীনচেতা। রজত একটু রক্ষণশীল। অশান্তি চলছিল অনেকদিন।

একদিন স্বামী-স্ত্রী দুজনার অনুপস্থিতিতে বাড়িতে চুরি হয়ে গেল। প্রায় তিরিশ লাখ টাকার গয়না, যা সবটাই লীলার। লীলা থানায় ডায়েরি করল এবং রজতের নামে দোষ দিল।

সবটাই নকল। প্ল্যানড। কোনো গয়নাই চুরি হয়নি। লীলাই সরিয়ে রেখেছিল। চুরির সময় কোথায় ছিল রজত, ঠিকভাবে বলতে পারছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই ভগবতীবাবু আসরে নামেন এবং বহু কাঠখড় পুড়িয়ে জোগাড় হল একটা নাইট শো-এর সিনেমার টিকিট। এবং সাক্ষী হিসেবে হলের লাইট ম্যান।

রজত তো মুক্ত হল। কিন্তু নড়ে গেলেন সৎ এবং সংযমী ভগবতীবাবু। কমলকে বললেন, কী আশ্চর্য! দেখো, একটা নকল টিকিট আর একজন নকল সাক্ষী নির্ধারণ করে দেয়, কোন মানুষ সৎ না অসৎ।

ভগবতীবাবু কমলের কাছে খুনের মামলাটার ডিটেল জানতে চান। কমল জানায়, অভিযুক্তের নাম ছেদিরাম। পেশায় দিনমজুর। সে নাকি তার স্ত্রী তারাকে খুন করেছে। ছেদিরামের বক্তব্য, সে নির্দোষ। যখন খুন হয়েছে সে তখন ট্রেনে ছিল। কিন্তু ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায়নি। কোনো সাক্ষীও পাওয়া যায়নি।

ভগবতীবাবু নিজের মনে বিড়বিড় করেন। ঠিক রজতের মতো।

কমল বলে যায়, ছেদিরাম বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে চলে যায়। ছয় দিন পরে ফেরে। চারদিন ট্রেনে ট্রেনে আর দুদিন দিল্লিতে ছিল। কোথায় ছিল তা সঠিকভাবে বলতে পারেনি। সে দিল্লি থেকে ফেরে যখন তখন রাত দশটা। বাড়ি ফিরতে ফিরতে, অবশ্যই হেঁটে হেঁটে, রাত দুটো।

বাড়ি ফিরে সে আর ঘরে ঢোকেনি। দাওয়াতেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাড়িতে তার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। সকালে প্রতিবেশী একজন দরজা খোলা আর বোমভোলা ছেদিরামকে দাওয়ায় শুয়ে থাকতে দেখে ঘরে এসে দেখে স্ত্রী মৃত। তার গলা কাটা। যথারীতি দোষ গিয়ে পড়ে ছেদিরামের ওপর। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গেছে, খুনের সময় সন্ধে সাতটা।

ভগবতীবাবু জানতে চান, অভিযুক্তের কাছে কী কী পাওয়া গেছে?

একটি মদের খালি বোতল, পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা ও একটা তেল মাখা কাগজের গোলা।

কী কাগজ? ভগবতী ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করেন!

একটা খবরের কাগজের টুকরো।

ভগবতী বলে, কোন খবরের কাগজ? কোথাকার?

কমল বলে, তা তো জানা যায়নি স্যর। একটা তেলমাখা খবরের কাগজের আর কী গুরুত্ব আছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভগবতী একটু হেসে বলেন, 'আছে। এটা নকল সিনেমার টিকিট নয়। আসল একটা খবরের কাগজ। একজন দিনমজুর একটা খবরের কাগজকে কেন পকেটে রাখবে? খোঁজ নাও। আমার মনে হচ্ছে লোকটা নির্দোষ। রজতের মতো।'

পরের দিন কমল বলে, 'খবরের কাগজটা 'লোকতন্ত্র' বলে একটা ছোট দৈনিক কাগজ, যেটা দিল্লি থেকে বেরোয়। মূলত দিল্লিতেই চলে। বাইরে খুব একটা সার্কুলেশন নেই।'

ভগবতী জানতে চান, কাগজটা কবেকার?

কমল জানায়, 'ছেদিরামের কথা অনুযায়ী যেদিন সে দিল্লির ট্রেনে ওঠে সেদিনকার।'

ভগবতী বলেন, 'যে কাগজের সার্কুলেশন কম, সে কাগজ সুদূর দিল্লি থেকে ভূপালে এল কী করে? শুধু অ্যালিবাই হবে বলে?'

ঘটাদা এবার চুপ করলেন। আমরা ঘটাদার দিকে তাকিয়ে আছি রুদ্ধশ্বাসে। ঘটাদা বললেন, 'না, যাই। মেয়েটার জ্যামিতি বক্স কিনতে হবে। কাল পরীক্ষা।'

আমি বললাম, 'বা-রে? তারপর কী হল?'

ঘটাদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'তারপর আর কি? ট্রেনের টাইম টেবিল ঘেঁটে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে দেখা গেল ছেদিরাম নির্দোষ। ফাঁসির দড়ি থেকে বেঁচে গেল। বেকসুর খালাস।'

চন্দন বলল, 'এই তা হলে তোমার প্রজাপতি।'

ঘটাদা হেসে বলেন, 'ইয়েস, এই হল বাটারফ্লাই এফেক্ট। অসীমবাবুর গায়ে চা না পড়লে লটারির টিকিটটা ভূতনাথ পেত না। ভূতনাথ যদি চরণদাস চোরের সাইকেলের চাকার ফুটো সারিয়ে না দিত তা হলে কনস্টেবল কানাইয়ের শাশুড়ির বালা চরণকে চুরি করতে হতো না। সে বালা যদি পিতলের না হতো তা হলে তুলিরামের চোখে কোনো সমস্যা হতো না। আর তুলিরামের চোখে সমস্যা না হলে এম.পি. রাধামদন মিত্রর চেহারা কুমার শান্তনুর মতো হতো না। কুমার শান্তনুর মতো ছবির চেহারা না হলে গ্রামের নেতা প্রতাপের ওপর রাধামদন মিত্রের রাগ হতো না। প্রতাপ যদি সে রাগ ভাঙাতে দিল্লি না যেত, তবে ছেদিরামের সঙ্গে তার আলাপ হতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। ছেদিরাম যদি দুটো দিন দিল্লিতে না থাকত, তা হলে তার স্ত্রী তারা খুন হতো না। সর্বোপরি দিল্লি স্টেশনে প্রতাপ যদি ছেদিরামকে শিঙাড়া না খাওয়াত, তবে তার পকেটে তেলমাখা খবরের কাগজটা আসত না। আর খবরের কাগজটা না থাকলে ছেদিরাম যে নির্দোষ সেটা প্রমাণ হতো না।

বুঝলি, সবই প্রজাপতির লীলা। প্রজাপতির মায়া। আমরা হলাম প্রজাপতির প্রজা। নাহ্! এবার যেতেই হবে। জ্যামিতি বক্স কিনতে হবে।'

আমি বললাম, 'না কিনলে কী হবে?'

ঘটাদা উঠতে গিয়ে উবু হয়ে বসে বললেন, 'জ্যামিতি বক্স না কিনলে কী হতে পারে?' একটু দম নিয়ে বললেন, 'হয়তো আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পড়েও যেতে পারে।'

আমরা নতুন গল্পের গন্ধে বলে উঠলাম, 'কীরকম, কীরকম?'

ঘটাদা একটু হেসে হনহন করে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আজ নয়, আরেক দিন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

। শনিবার। অফিস থেকে সোজা বাড়িতে ঢুকলাম। জামাকাপড় ছেড়ে, স্নান করে, একটা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, এক কাপ কফি নিয়ে ড্রয়িং রুমে বসলাম। দেখলাম, ঘড়িতে সাতটা বাজে। ওদের আসার সময় হয়েছে। ওদের জন্যও কফি রেডি করে রেখেছি। এলেই মাইক্রোওভেনে গরম করে দেব।

টিভিটা চালিয়ে দিলাম। সংবাদ চ্যানেল। আমাদের দেশে এখন সংবাদ কোথায়? সবই তো দুঃসংবাদ। খবরে বলছে, কিছুদিন আগে এক হাজার টাকার নোট বাতিল হয়েছিল। এবার নাকি দু-হাজার টাকার নোট বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আমার তো পিলে চমকানোর অবস্থা। অনেক কষ্টে আগের নোটবন্দির জরুরি অবস্থা সামলেছে দেশবাসী। আবার নোটবন্দি?

চ্যানেল ঘোরালাম। অন্য চ্যানেলে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিমা ব্যানার্জি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, এই নোটবন্দির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে।

এমন সময় মনোজিৎ ঢুকল। দরজা খোলাই ছিল। আমার মতো ওর চোখও গেল টিভির দিকে। বলল, 'এই একজনই তো আছে, যে এই মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা অন্তত বোঝার চেষ্টা করছে।'

আমি বললাম, 'কী জানি! ওরও তো অনেক শত্রু।'

মনোজিৎ খিচিয়ে উঠল, 'থাম তো! সে তো যিশুখ্রিস্ট বা সুভাষচন্দ্রেরও অনেক শত্রু ছিল। তা বলে সৎ উদ্দেশ্যকে সৎ বলব না? সারা দেশের সমস্ত রাজ্যগুলো মৌলবাদী শক্তিরা দখল করে নিয়েছে। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে শুধু আমাদের রাজ্য ছাড়া গোটা দেশ কাঁপছে। তার কৃতিত্ব ওই মহিলাকে দিবি না! সারা দেশের সমস্ত আঞ্চলিক দলগুলোকে কিনে নিয়েছে। শুধু আমাদের রাজ্য ছাড়া। তার জন্য ওনাকে ধন্যবাদ দিবি না?'

মনোজিতের কথার মধ্যেই ওরা দুজন ঢুকল। পল্লব এবং রাজীব। এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোফায় বসল। আমি উঠে গেলাম কফি আনতে।

মনোজিৎ বলেই চলেছে, 'ভাবতে পারছিস, মৌলবাদীদের হাতে আমাদের রাজ্যটা চলে গেলে, দাঙ্গা থেকে কেউ বাঁচবে?'

আমি ততক্ষণ কফি নিয়ে চলে এসেছি।

রাজীব কফির মগটা হাতে নিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'তোরা এই রাজনৈতিক ড্যামনামিগুলো থামা না। নিজেদের সমস্যায় পেছন কালো হয়ে গেল, আবার দেশের সমস্যা।'

মনোজিৎ এবার মারমুখো, 'তোদের শালা বউ ছাড়া তো আর কোনো সমস্যাই নেই। যত সব মেনিমুখোর দল। তোদের তো বউমুখী বস্তাপচা একটা জীবন। ওই ভদ্রমহিলাকে দ্যাখ। ওনারও সংসার আছে। কোথাও দেখেছিস তোদের মতো আদিখ্যেতা করতে, সংসার বউ—বউ সংসার। সংসার তো করিস না, যেন দেশ উদ্ধার করছিস। যতসব স্বার্থপর পেটি বুর্জোয়া। নিজেদের বাইরে একটু তাকা। ভদ্রমহিলাকে দ্যাখ। আমরা ভালো করে জানিই না, ওনার স্বামী-বাচ্চাকে কেমন দেখতে। আর তোরা সারাক্ষণ বউকে তুষ্ট করার জন্য সেল্‌ফি অফ পেজ সব জুড়ে শুধু বউ আর বউ। শালা পা চাটা কুকুরের দল।'

পল্লব এবার আমার দিকে অসহায় ভাবে তাকায়। আমি মনোজিতকে শান্ত করতে একটা কফির মগ ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। মনোজিৎ কফিতে চুমুক দিয়েও শান্ত হতে পারছিল না। গজগজ করেই যাচ্ছিল। আমি কথা ঘোরাবার জন্য বললাম, 'তোরা দুজন একসঙ্গে হলি কী করে? মানে দুজন তো দু-প্রান্তে থাকিস।'

পল্লব বলল, 'ও আমার অফিসে এসেছিল। তাই একসঙ্গে চলে এলাম।'

আমার কথাবার্তা এবার অন্যদিকে মোড় নিল। আমি অস্থির নিঃশ্বাস ফেললাম। আসলে আমরা এই চারবন্ধু হলাম হরিহর আত্মা। আমরা স্কুল থেকেই বন্ধু। এখন আমাদের বয়স চৌত্রিশের মধ্যে। রাজীব ও পল্লব বিবাহিত। মনোজিৎ ও আমি বিয়ে করিনি। আমি পাত্রী খুঁজছি। কিন্তু মনোজিৎ বলেছে, বিয়ে-টিয়ে ওর ধাতে নেই। ও বিয়ে করবে না।

আমরা প্রতি শনিবার নিয়ম করে আড্ডা মারতে বসি। এ ছাড়াও অন্যান্য ছুটির দিন তো আছেই। মূলত আমার ফ্ল্যাটেই আড্ডা হয়। কারণ আমি একা থাকি। মনোজিতের বাড়িতে ওর মা আছে। আর বাকি দুজন তো জীবিত নয়, বিবাহিত। যদিও এটা মনোজিতের কথা। তাই আমার ফ্ল্যাটটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড্ডা মারার মুক্তাঞ্চল।

এমনিতে আমাদের চারজনের বন্ধুত্ব অত্যন্ত প্রগাঢ়। কিন্তু মনোজিৎ মাঝে-মাঝে দুজন বিবাহিত মানুষদের ওপর প্রচণ্ড খাপ্পা হয়ে যায়। কারণ আমাদের বিবাহিত বন্ধু দুজন একটু কাঁদুনে গোছের। এরা এদের স্ত্রীদের ব্যক্তিত্বের চাপে নাজেহাল হয়ে থাকে। এমনিতে এদের স্ত্রীরা খারাপ নয়। এদের মধ্যে প্রতিভা আছে। পল্লবের স্ত্রী গান করে এবং সুকণ্ঠী। ধীরে-ধীরে তার নাম হচ্ছে। আর রাজীবের স্ত্রী কর্পোরেট জগতে আস্তে-আস্তে মহীরুহ হতে চলেছে। দুজন মহিলার পাশেই বিস্তর মানুষ এবং স্তাবকের দল। তাদের মাঝখানে কূলহীন দিশেহারা আমার দুই বন্ধু নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলতে বসেছে।

আমার একটু মায়া হয়। কিন্তু মনোজিৎ কড়া গলায় আমায় বলে, 'একদম সমবেদনা জানাবি না। নিজেদের লড়াই নিজেদেরই লড়ে শিখতে হবে। খোটে সিক্কে হতে হবে। মানে খেটে শিখতে হবে।'

আমি মনোজিতকে বোঝাতে পারি না যে, বন্ধুদের অসহায় অবস্থায় পাশে থাকতে হয়। আর খোটে সিক্কে মানে খেটে শেখা নয়।

সেদিনকার আড্ডা শেষ হল রাত সাড়ে দশটায়। যে যার গৃহমুখে প্রস্থান করল। আমিও বিছানা নিলাম।

AMARBOI.COM

পরের শনিবার আমি ফ্ল্যাটে বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করছি। এক সময় পল্লব এসে বসল। বললাম, 'কফি খাবি।'

ও বলল, 'না। জীবনটাই কফির মতো তেতো হয়ে গেছে।'

জানতে চাইলাম, 'কী সমস্যা?'

ও বিরক্তি সহকারে বলে চলে, 'আর বলিস না। সারাদিন ঘর ভর্তি একপাল লোক। নিজেকে মনে হয় ট্রেনের যাত্রী।'

আমি বলি, 'সে তো হবেই। পাপিয়ার এখন নাম হচ্ছে, একটু সহ্য তো করতে হবে।'

পল্লব খিচিয়ে ওঠে, 'আর কত? সেদিন সনৎ নামের এক ছোকরা আমার সামনেই বলে বসল, বউদি আপনার প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না। মানে ইঙ্গিতটা আমার দিকে বুঝলি?'

আমি হেসে বলি, 'এটাকে ব্যক্তিগতভাবে নিচ্ছিসটাই বা কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও বলে, 'নেব না? বউটা তো আমার। এরকম সার্বজনীন মন্তব্য কার ভালো লাগে! মূল্যায়ন হচ্ছে না মানে আমি ভিলেন, প্রেম চোপড়া।'

হঠাৎ মনোজিতের গলা, 'তুই তো গান শিখতে পারিস। তারপর কাঁটে কা টক্কর। একদম হৃষিকেশ মুখার্জির অভিমান। অমিতাভ-জয়া।'

আমি বলি, 'ইয়ার্কি মারিস না। সত্যিই ব্যাপারটা যন্ত্রণাদায়ক।

পল্লব একদৃষ্টিতে মনোজিতের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তাও গেছিলাম।'

আমরা তো অবাক। 'কোথায়? কোথায় গেছিলি?'

পল্লব বলে, 'গান শিখতে।'

আমরা আরও অবাক হয়ে বলি, 'গান শিখতে! কোথায়?'

পল্লব বলে, 'তোদের বলিনি। তিন মাস আগে বাণীচক্রে ভর্তি হয়েছিলাম। গান শিখব বলে। দু-মাস শেখানোর পর গানের মাস্টার বলল, আপনি বরং আবৃত্তির ক্লাসে ভর্তি হন। গানটা হবে না।'

আমরা হো হো করে হেসে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছি। পল্লব কাঁচুমাচু মুখ করে বসে আছে। আমাদের হাসি আর থামছেই না। এমন সময় রাজীব ঢুকল, 'কী হল? হাসছিস কেন?'

আমরা সবিস্তারে বিষয়টা বললাম।

রাজীব কিন্তু হাসল না। বলল, 'তোদের হাসি পাচ্ছে কারণ, তোরা পাড়ে দাঁড়িয়ে নৌকো ডোবা দেখছিস তাই। নৌকোর মানুষগুলোর যন্ত্রণা বুঝতে নৌকোয় উঠতে হবে।'

আমরা তখন সত্যিই একটু লজ্জায় পড়লাম।

এবার দেখলাম মনোজিৎ নরম গলায় বলল, 'কী করা যাবে! তোদের স্ত্রীরা ট্যালেন্টেড। তোরা সেই অর্থে তাদের সমকক্ষ নোস। এটা মেনে নে না।'

আমি বললাম, 'এ তো ঈশ্বরের দান। সবাইকে একরকম তো বানায় না। তোরা তোদেরটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে থাক না।'

এবার রাজীব দার্শনিকের মতো বলে, 'ভালোবাসার মানুষদের সমকক্ষ ভাবার মধ্যেই ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে। না হলে প্রভুত্ব মনে হয়। মনে হয় দাস ও প্রভুর সম্পর্ক।'

পল্লব বলে ওঠে, 'ঠিক বলেছিস। মনে হয় চামচাগিরি করছি। সারাক্ষণ প্রশংসা করতে হবে।'

আমি বললাম, 'পাপিয়া তো সত্যিই প্রশংসা করার মতো গান গায়। আর রাজীবের বউ রোজি তো সত্যি একজন কম্পিটেন্ট মানুষ। এটা তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্বীকার করার কোনো জায়গাই নেই।'

রাজীব বলল, 'ওইখানেই তো সমস্যা। তোরা বুঝবি না। সবচেয়ে পাশের মানুষটা প্রতিভাসম্পন্ন হলে কী জ্বালা। বিশেষ করে তার সমকক্ষ হওয়ার কোনো সুযোগই যখন থাকে না।'

মনোজিৎ হঠাৎ বলে ওঠে, 'তবে তাদের প্রতিভাকে একটু ছেঁটে কম করে দিতে পারলে কেমন হয়?'

আমরা সবাই কথা বলা ভুলে গেলাম। মনোজিতের দিকে বেশকিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। পরে পল্লব একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সত্যিই যদি তাই হত।'

মনোজিৎ সোফায় গা এলিয়ে ছিল। হুড়মুড় করে উঠে বলল, 'আলবাত হতে পারে।'

আমি বললাম, 'কী করে?'

মনোজিৎ বলল, 'একটু রণকৌশল প্রয়োগ করতে হবে। যেমন ধর, রাজীবের বউ রোজি, ওর প্রতিভা কোথায়? উপস্থিত বুদ্ধি ও ইনফরমেশনের ডিসিশন মেকিং-এ। এবার যদি ওই জায়গাগুলো একটু শ্লথ হয়ে যায়, একটু কম পড়ে যায়, তা হলে তো ও অ্যাভারেজ বা সাধারণ মানুষ হয়ে যাবে। ঠিক রাজীব যেমনটি চাইছে তেমন। ঘরের বউ হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'এতে তো ওর কেরিয়ারটা নষ্ট হয়ে যাবে। এ তো অন্যায়।'

মনোজিৎ বলে, 'যুদ্ধ এবং ভালোবাসায় সবই বৈধ। আর রাজীব তো ওকে তার জন্যে দুরছাই করবে না। বরং আরও ভালোবাসবে। কীরে রাজীব, তাই না?'

রাজীব বিড়বিড় করে, 'মাথায় করে রাখব।'

আমার ধন্ধ এখনও কাটছে না, 'কিন্তু এটা সম্ভব হবে কী করে? আমরা তো কেউ অলৌকিক শক্তিধর নই যে হাত তুললাম সমুদ্র ভাগ হয়ে গেল। তাকালাম, আর একজন কম্পিটেন্ট থেকে ইনকম্পিটেন্ট হয়ে যাবে।'

মনোজিৎ হেসে বলে, 'এখানেই একটু বুদ্ধি খরচ করতে হবে। যেমন ধর, রাজীবের বউ রোজির মূল শক্তিটা কোথায়, ওর মাথাতে। কিন্তু যদি চব্বিশ ঘণ্টার আঠারো ঘণ্টাই ওর মাথা ধরে থাকে, তা হলে ও কি আর মাথা খাটাতে পারবে? না পারলে ওর ডিমোশন। প্রতিভার অপমৃত্যু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'আমরা কী করে রোজির মাথা ধরাব?'

মনোজিৎ বলে, 'আমরা নয়, রাজীব ধরাবে।'

রাজীব অবাক হয়ে মনোজিতের দিকে তাকিয়ে একসময় বলে, 'কী করে?'

মনোজিৎ বলে, 'রোজির চশমাটা বদলে দিবি। ঠিক একইরকম দেখতে আরেকটা চশমা ওকে অফিসে যাওয়ার সময় প্লান্ট করে দিবি। যেটার পাওয়ার আসলটার চেয়ে কম। আবার বাড়িতে ফিরলেই নকলটাকে লুকিয়ে আসলটা রেখে দিবি। এরকম দিন সাতেক চললেই মাথা যন্ত্রণা হবেই।'

পল্লব বলে ওঠে, 'না ঘুমোলেও মাথায় যন্ত্রণা হয়। কফি খেলে ঘুম কমে।'

আমি বললাম, 'ইয়েস, রাতের ঘুমটাও ডিসটার্ব করে দিতে হবে। যেমন, অসময়ে মাঝরাতে ফোন বেজে উঠবে।'

এইভাবে সেদিন আলোচনা পর্ব শেষ হল। যে যার বাড়ি গেল এক নতুন অভিযানের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে।

সাতদিন কেটে গেছে। শনিবার আমি ওদের অপেক্ষায় বসে। প্রথমে ঢুকল রাজীব, শিস দিতে দিতে। ফুর্তির কারণ জানতে চাওয়ায় বলল, 'কাজ দিচ্ছে!'

আমি তো অবাক। লাফিয়ে উঠেছি, 'বলিস কী রে?'

এরমধ্যে বাকি দুজনও ঢুকল। সবটা শুনে আমরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। আমাদের প্ল্যান ঠিকমতো কাজ করছে। আমরা প্রতিভা কম করার রাস্তা খুঁজে পেয়ে গেছি।

পল্লব ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল, 'মাইরি, আমারটা একটু দ্যাখ।'

এবার রাজীবই বলল, 'শুনেছি, সিঁদুর খেলে গলা খারাপ হয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'কী বলছিস? যদি বোবা হয়ে যায়?'

পল্লব বলে, 'বোবা যেন না হয়, সেইভাবে ভাব।'

মনোজিৎ বলে, 'কম পরিমাণ দিলে বোবা কেন হবে? শুধু গলার পিচটা একটু নাড়িয়ে দিতে হবে। যাতে পারফেকশানটা চলে যায়।'

রাজীব বলে, 'একটু খেলে কিছু হবে না। পানের মধ্যে মিশিয়ে দিলে কেমন হয়?'

এইভাবে আমরা রাত অবধি নানা রকম আনতাবড়ি টোটকা প্রয়োগ নিয়ে কথা বলে গেলাম। এবং একসময় আড্ডা ভঙ্গ হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস ছয়েক পার হয়ে গেছে। আজও শনিবার, আমরা আড্ডা মারছি। আমাদের বিবাহিত বন্ধুরা এখন আর কাঁদুনে নেই। বেশ হাসছে, ফুর্তি করছে। পাপিয়া এখন একটা বাচ্চার কথা ভাবছে। রাজীবের স্ত্রীর রোজির কাজের চাপ অনেক কম। আশেপাশে লোকজনও অনেক কমে গেছে। রাজীবকে সে এখন অনেক সময় দেয়।

একটু অপরাধবোধ ছিল। কিন্তু তা বন্ধুদের হাসিমুখ দেখে মুছেও গেছিল। বুদ্ধিটা মনোজিৎ-ই দিল, 'শোন আমরা তো এক গুপ্ত বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছি। তা এবার আমাদের বিদ্যেটা যদি দশজনের জন্য প্রয়োগ করি তবে, কত লোকের ভালো হতে পারে। কী বলিস?'

আমি বললাম, 'কী রকম? একটু ব্যাখ্যা কর।'

মনোজিৎ বলে, 'দ্যাখ, পৃথিবীতে প্রতিভাবান মানুষ তো কম নেই। পাশাপাশি প্রতিভাহীন অসুখী মানুষও কম নেই। প্রতিটা প্রতিভাবান মানুষের পাশের মানুষ অসুখী। কারণ তারা তাদের ভালোবাসার মানুষটার সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে না, এটাই তাদের অসুখের কারণ। এদের সংখ্যা খুব একটা কম নয়। আমাদের চারজনের মধ্যেই দুজন ছিল। তার মানে, পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ দুঃখে আছে। আর আমরা যদি আমাদের অর্জিত জ্ঞানের একটু টিপ্‌স ওদের দিতে পারি, তবে বল কত লোক সুখী হতে পারে!'

পল্লব বলে, 'তাহলে কি আমরা আশ্রম বা স্কুল খুলব?'

মনোজিৎ বিরক্ত হয়ে বলে, 'দুর—! ওসব অনেক পুরোনো ব্যাপার, আজকে এই ইন্টারনেটের যুগে ওসব করলে হবে? আমরা একটা বেনামে সাইট খুলতে পারি। ঘোষণা করব, প্রিয় মানুষদের প্রতিভা কম করে সমকক্ষ বানানোর রাস্তা জানুন। যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে। ব্যস।'

আমি বললাম, 'কোথায় যোগাযোগ করবে। আমাদের সাইটের নাম কী?

মনোজিৎ হেসে বলল, 'খুনিস অফ গুণিস।'

এরপর থেকে আমাদের দম ফেলার ফুরসত নেই। শুধু শনিবার নয়, রোজই আমরা মিলিত হতে শুরু করলাম। আমাদের চোখ এখন ল্যাপটপে। 'খুনিস অফ গুণিস' এখন হিট। বহুমানুষ তাদের সমস্যার কথা আমাদের জানাচ্ছে। আমরাও আমাদের সাধ্যমতো রাস্তা বলে যাচ্ছি। কেউ কেউ ফল পাচ্ছে, কেউ কেউ পাচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা যদিও কারো নাম জানতে চাই না। শুধু সমস্যা এবং তার সমাধান। যারা ফল পাচ্ছে, তারা ধন্যবাদ জানাচ্ছে। ওইটুকুই। যেমন, একজনের স্বামী পেন্টার। প্রতিভাবান। তার স্ত্রীকে আমরা বুদ্ধি দিচ্ছি কী করলে ওনার হাত কাঁপবে। পার্কিনশন হবে। কী করলে ডোপামিন লেবেল কমবে। হ্যালোপেরিডল খাওয়াতে হবে। এসবই টোটকা। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজও দিচ্ছে। তাতে বেশ কিছু মানুষ উৎসাহিত হয়ে আমাদের দ্বারস্থ হচ্ছে। আমরা একধরনের ছেলেমানুষিতে মেতে উঠেছি।

এরই মধ্যে এসে গেল বিশ্বকাপ। আমরা খেলা দেখছি আর্জেনটিনার। গ্যালারিতে মারাদোনা।

মনোজিৎ বলে, 'এই মানুষটার প্রতিভা যদি কেউ কম করতে বলে, তবে শালা খুন করে দেব!'

আমি বললাম, 'কেন? এবার কেন? কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ। আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

মনোজিৎ নিজেকে বাঁচাতে বলে, 'আমাদের কাছে দিয়াগোর মতো ট্যালেন্টেড কোনো লোকের জন্য কেউ আসেনি।'

আমি বললাম, 'আমরা কী করে জানব? আমরা তো আমাদের ক্লায়েন্টের নাম জানতে চাই না।'

পল্লব ল্যাপটপ নিয়ে বসেছিল। হঠাৎ বলল, 'দ্যাখ, একটা বেয়াড়া আবদার এসেছে।'

আমরা হুমড়ি খেয়ে ল্যাপটপটার ওপর নজর দিলাম। একজন সমস্যার কথা নয়, দেখা করতে চাইছে। এখনো পর্যন্ত আমাদের কোনো ক্লায়েন্ট আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়নি। আমরা কেউ খুব একটা পাত্তা দিলাম না। কিন্তু কয়েকদিন ধরে তারপর থেকে একই আবেদন আসতে থাকল।

একদিন আমরা বিষয়টা নিয়ে আলোচনায় বসলাম। পল্লব আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভিতু। ও বলে, 'কী রে মাইরি? পুলিশ-টুলিশ নয় তো?'

মনোজিৎ বলে, 'দুর শালা, পুলিশ কেন হবে! হাজার হাজার সাইট আছে, যারা নানা বিষয়ে উপদেশ দেয়। যেমন, টাকে কী করে চুল গজাবে, কী করে লম্বা হবেন ইত্যাদি। এর জন্য পুলিশ কেন আসবে? আমরা উপদেশ দিলাম, গ্রহণ করা-না করা মানুষের ব্যাপার। আর আইনগতভাবে কিছুই হবে না। কারণ আমরা আমাদের উপদেশগুলোর পেছনে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন লাগিয়েছি। যেমন ঘুম কমিয়ে দিলে কেমন হয়? পটাশিয়াম লেবেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেমে গেলে মানুষের স্মৃতিভ্রংশ হয়। পাস্তা খাওয়ালে কেমন হয়? এইরকম আর কী?'

আমি বলি, 'সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু এই মানুষটা যদি আমাদের গিনিপিগ হয়? যার ওপর আমরা আমাদের বিদ্যা প্রয়োগ করেছি, তেমন কেউ? সে জানতে পেরে গেছে।'

মনোজিৎ বলে, 'সে সম্ভাবনা কম। তা হলে সে ভদ্রতার সঙ্গে আবেদন করত না। গালাগাল দিত।'

রাজীব বলল, 'দ্যাখ, তোরা যা ভালো বুঝবি।'

মনোজিৎ বলে, 'চল না দেখি কে এবং কেন দেখা করতে চাইছে খুনিস অফ গুণিসদের সঙ্গে।'

দিন সাতেক পরে আমরা দশটার সময় দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চের সামনে একটা ঝুপসি গাছের নীচে মনোজিতের গাড়িতে বসে সিগারেট খাচ্ছি। জানুয়ারি মাস। প্রবল ঠান্ডা। অজানা মানুষটার সঙ্গে এখানেই দেখা করার কথা হয়েছে। সময় রাত দশটা। আমাদের গাড়ির নম্বর বলে দেওয়া হয়েছে।

একটা গাড়ি এসে পাশে দাঁড়াল। গাড়িতে একজনই বসে ড্রাইভারের আসনে। গাড়ির কাচ নামাল। চাপা গলায় লোকটা প্রশ্ন করল, 'খুনিস অফ গুণিস?'

মনোজিৎ বলল, 'ইয়েস।'

লোকটা বলল, 'আমার গাড়িতে উঠে আসুন।'

আমরা তাই করলাম। একটা বড় ইনোভা। আমরা চারজন পেছনের সিটে বসলাম। লোকটা একটা মাঙ্কি টুপি ও জ্যাকেট পরে থাকায়, মুখটা দেখা যাচ্ছে না।

লোকটা বলল, 'ও, আপনারা চারজন।'

মনোজিৎ বলল, 'বলুন কেন ডেকেছেন।'

লোকটা বলল, 'আপনারাই তো খুনিস অফ গুণিস? অর্থাৎ গুণীদের খুনি।'

আমরা বললাম, 'ইয়েস।'

লোকটা বলে, 'আপনারাই তো উপদেশ দেন, কী করে প্রিয় মানুষদের গুণের মানে প্রতিভার মাত্রা কমিয়ে সমকক্ষ করা যায়।'

মনোজিৎ বলে, 'হ্যাঁ, কিন্তু কেন ডেকেছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটা এবার একটু চুপ করে বলল, 'আমার স্ত্রী।'

আমি বললাম, 'আপনার স্ত্রীর কী ধরনের প্রতিভা?'

লোকটা একটু ইতস্তত করে বলে, 'বহুমুখী।'

পল্লব বলে, 'আপনার সমস্যাটা কী রকম?'

লোকটা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলে, 'আসলে আমার স্ত্রীর মনোযোগ মানুষের সঙ্গে শেয়ার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। আমি আমার স্ত্রীকে একটু নিজের করে পেতে চাই।'

পল্লব বিড়বিড় করে আমার কানের কাছে বলে, 'ঠিক আমার মতো কেস।'

মনোজিৎ বলে, 'তা নয় আমরা দেখে দেব। কিন্তু এটা বলার জন্য মুখোমুখি ডাকার কী দরকার ছিল?'

লোকটা বলে, 'আমি আপনাদের চিনতে চাইছিলাম। একটু শিওর হতে চাইছিলাম। আপনাদের দেখে ভালোমানুষ বলেই মনে হল। অন্তত আপনারা সেনসিটিভ। আমার যন্ত্রণা বুঝবেন বলেই মনে হল। আর কিছুই না।'

আমরা লোকটাকে আরেকটা ডেট দিলাম। আমরা আমাদের উপদেশ ওনাকে সেদিন দিয়ে দেব। কাগজে টাইপ করে। কিন্তু লোকটা নিজের স্ত্রী সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলল না। আর লোকটাকে তো ভালো করে দেখাই গেল না।

পরের ডেটে একই সময় আমরা আমাদের গুপ্ত বিদ্যার যত টোটকা আছে সব টাইপ করে লোকটাকে দিলাম। এবারেও লোকটা জ্যাকেট ও মাঙ্কি টুপি পরে।

লোকটা বলল, 'আপনাদের কোনো পারিশ্রমিক নেই?'

মনোজিৎ হেসে বলল, 'না। আমরা মানুষের উপকারের জন্য এই কাজটা করি।'

লোকটা ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করল। তখনই রাস্তার আলোয় দেখলাম এবং অনুভব করলাম লোকটার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটার তলায় একটা বড় কালো জরুল আছে। লোকটা একসময় অন্ধকার রাস্তা ধরে গাড়ি নিয়ে চলে গেল। আমরাও বাড়ি ফিরে গেলাম।

দিন কেটে যাচ্ছে মহা আনন্দে। এর মধ্যে পল্লবের একটা ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে। কিন্তু আমাদের আড্ডার আগুন এখনও কমেনি। সবাই ঠিক সময়ে হাজিরা দিয়ে চলেছে।

আড্ডা তো একটা কারণ। তা ছাড়া আছে খুনিস অফ গুণিস। আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের গুপ্তবিদ্যার গুণ যাচাই করেই চলেছি । নানান ক্লায়েন্টের ওপর। এটা একটা প্রায় নেশার মতো হয়ে গেছে।

এদিকে দেশের অবস্থা সংকটজনক। মৌলবাদী শক্তিরা আমাদের রাজ্যে দাঙ্গা বাধাবার নানান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিন মাস বাদে নির্বাচন। রাজ্য সরকার অর্থাৎ প্রতিমা ব্যানার্জির সরকার প্রবল শক্তিতে সাম্প্রদায়িক শক্তিদের প্রতিরোধ করেই চলেছে।

এরকমই একদিন সন্ধেবেলা আমরা আড্ডা মারছি। টিভিটা চলছিল। হঠাৎ-ই দেখি টিভিতে বলছে, 'মুখ্যমন্ত্রী প্রতিমা ব্যানার্জি হাসপাতালে। উনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। আজ হাসপাতালে ভর্তি হলেন।'

ডাক্তার বলছে, 'এ একধরনের স্নায়বিক রোগ। এতে মানুষের মৃত্যু হয় না, কিন্তু কর্মশক্তি কমে যায়। মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। হাইপোক্যালিমিয়া বা পটাশিয়াম নেমে যায়। ডোপামিন হরমোনও নেমে যায়, যাতে মানুষের পার্কনসন দেখা দেয়।'

এরপরই টিভিতে জনগণের উদ্দেশ্যে ওনার স্বামী সোমনাথ ব্যানার্জি আশ্বাস দিলেন, 'উনি তিন-চার মাসের মধ্যে ভালো হয়ে যাবেন।'

টিভিতে এবার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'তিন মাস পরে নির্বাচন। মুখ্যমন্ত্রী নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ায় মৌলবাদী শক্তিদের জয়ের শতাংশ একশো ভাগ। রাজ্য সরকার পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই দুশো ভাগ।'

এমন সময় আবার রিপিট টেলিকাস্টে মুখ্যমন্ত্রীর স্বামীকে দেখাল। তিনি আশ্বাস দিচ্ছেন জনগণকে। হঠাৎ দেখলাম উনি যে হাতে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন সেটা ডান হাত। আর সে হাতের বুড়ো আঙুলের নীচে একটা বড় কালো জরুল।

আমরা আর কিছু শুনতে চাইছি না। টিভিটা নিজের মনে কী বলে চলেছে। আমরা চারজন নিজেদের মূর্খতায় একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ ভালো। মানে অন্যরকম। এখানে কোনো দূষণ নেই।

র। ঘুম খুব একটা পায় না। রাত্রিও নেই। শরীরও খুব ভালো থাকে। খিদেও তেমন পায় না। তাই কিছু না কিছু করতে ইচ্ছে করে। কী আর করব! তাই কাজই করি।

শুধু আমি না, সবাই তাই করে। এবং হাসিমুখে। এখানে ক্লান্তিভাবটা আসেই না। এখানে সবাই একে অপরের কাজ করে দিয়ে আনন্দ পায়। এখানে হিংসা বা রাগ, মানে ষড়রিপুর কোনো স্থান নেই। সব সময় মন ভালো। হয়তো আবহাওয়ার রসায়নের কারণে।

প্রায় বছর তিনেক এখানে আছি। আমরা যেখানে থাকি, সে জায়গার নাম প্রকোষ্ঠ ১। আমরা সেক্টর ওয়ানই বলি। এখানে চাষবাস হয়, কারখানাও আছে। আছে গবাদি পশুর খামার, আছে দুগ্ধ প্রকল্প। আছে শিল্প-সংস্কৃতি কেন্দ্র, চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তবে খুবই ছোট। কারণ এখানে কেউ অসুস্থই হয় না। এক কথায় বলতে গেলে প্রায় স্বর্গেই আছি।

এই ভালো থাকা হয়তো এত তাড়াতাড়ি হতো না। যদি মাস তিনেক আগে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে না পড়তাম! তখন আমার মাত্র তিরিশ বছর বয়স। তারপর থেকে এখানে।

এখানে একটাই অনুশাসন। পূর্বাশ্রম বা পূর্বজীবনের কথা আলোচনা করতে নেই। তার কারণও বলা হয়েছে, পূর্বজীবনের কথা মনে করলেই হয় অনুশোচনা জাগবে আর নয়তো রাগ জাগবে। এ দুটোই এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খায় না। কারণ আমি দুঃখ পেতে চাইলেও দুঃখ পাব না। আর রাগ করতে চাইলেও রাগব না। সুতরাং এখানকার একটাই থিওরি 'গতস্যঃ শোচনা নাস্তি'। ঘুরে বেড়াও আর কাজ করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখান থেকে কিছু দূরে আরও অনেক সেক্টর আছে। কিন্তু সেখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ। তবে শুনেছি আমাদের সেক্টরই নাকি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। এবং নিয়মকানুনও অনেক উদার।

আজকের সকালটাও বেশ সুন্দর। তিন দিন হল আমি এখন একটা কৃষি প্রকল্পে কাজ করছি। এর আগে ছিলাম শিল্প বিভাগে অর্থাৎ কারখানায়। আমি আর অনীশ একটা জমিতে ধান চাষ করি। অনীশ অনেকক্ষণ কাজ করে কর্দমাক্ত জমিটায় বসে সিগারেট খাচ্ছে। আমি কিছুক্ষণ পরে কাজ সেরে ওর পাশে গিয়ে বসলাম।

অনীশ বলল, 'একটা গান গা।'

আমি বললাম, 'এখন? কাজ ফেলে গান!'

ও বলল, 'আকাশটা কী সুন্দর বল তো। পৃথিবীতে থাকলে কী করতি? গান...'

আমি হেসে বললাম, 'এটা তো পৃথিবী নয়।'

ও কী বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় আমাদের কৃষকদের সুপারভাইজার, মিঃ ডং দেখলাম ছুটতে ছুটতে আসছে। আমাদের সামনে এসে বলল, 'কী ব্যাপার? বসে পড়েছ? শরীর খারাপ নাকি?'

অনীশ বলল, 'না, না। একটু গান শুনতে ইচ্ছে করছিল।'

মিঃ ডং একটু উদাস হয়ে বললেন, 'গান। তা ভালো। জানো আমিও একটা সময় কবিতা লিখতাম। ভালোই লিখতাম। অন্তত লোকে তা-ই বলত।'

বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর কিছুক্ষণ বসে থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এবার ওঠো, কাজে যাও।'

বলে আমাদের দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি আর অনীশ তার হাত দুটো ধরলাম। কিন্তু উঠলাম না।

অনীশ বলল, 'দেখুন যদি তুলতে পারেন।' আমরা দুজনে জমিতে চেপে বসে রইলাম। মিঃ ডং আমাদের হাত ধরে প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে টানতে টানতে হেসে ফেলে বললেন, 'জানো, আমি একটা গোটা জাতিকে এই ভাবে মাটি থেকে টেনে নিজে পায়ে দাঁড় করিয়ে ছিলাম। আমার সঙ্গে রসিকতা!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেই আরও শক্তি প্রয়োগে আমাদের দাঁড় করিয়ে ছাড়লেন।

আমরা তিন জনেই হাসছি। মিঃ ডং বললেন, 'একটা জাতির তুলনায় তোমরা তো নস্যি।'

অনীশ হঠাৎ-ই বলে বসল, 'কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবটা?'

মিঃ ডং-এর মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল। চোখ দুটোয় যেন অতীতের ধূসর রং খেলা করে উঠল। কিছুক্ষণ অনীশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে অনুশোচনা বা আত্মগরিমা দুটোরই কোনো স্থান নেই। তাই এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অবান্তর।'

বলেই মাঠের আল ধরে আমাদের পেছনে রেখে এগিয়ে গেলেন।

অনীশ আমার দিকে ফিরে বলল, 'লোকটাকে চিনতে পেরেছিস?'

আমি বললাম, 'পেরেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ৃটা বলেছিল তুমি আমায় বিশুদা বলেই ডেকো। বলেই একগাল
়াসি হেসেছিল। হাসিটা খুব ভালো লেগেছিল। খুব চেনাও
মনে হয়েছিল।

বিশুদার সঙ্গে প্রথম যখন দেখা হয়েছিল, তখন আমার বয়েস নয় কি দশ, বিশুদার আঠেরো কি উনিশ। সেদিন আমি ছিলাম ছাদে। সামনেই বিশ্বকর্মা পুজো। আকাশে রং-বেরঙের ঘুড়ির ঝাঁক। একটা ঘুড়ি কেটে গিয়ে পড়ল লালাদের বাগানে।

এমনি আমার বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। কিন্তু রোখ চেপে গেল, ঘুড়িটা চাই। সন্তর্পণে সবার চোখ এড়িয়ে ছাদ থেকে নেমে চলে গেলাম বাড়ির পেছনের গলিতে। একটা পাঁচিল, ওটা পার হতে পারলেই লালাদের বাগান। দেওয়ালের ইটে পা দিয়ে দিয়ে পাঁচিলটা বাইতে শুরু করেছি এমন সময় বিশুদা এসে দাঁড়াল। বলল, 'না বীরেশ, ও কাজটা করতে যেও না। পাঁচিলের ওপর ধারালো কাচ লাগানো আছে। রক্তপাত, দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী।'

কী ছিল লোকটার গলায় জানি না। আমি পাঁচিল থেকে নেমে এলাম। লোকটা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'গুড বয়।'

তারপর হাসল। আমিও লজ্জার হাসি হেসে, দৌড়ে বাড়ি চলে গেলাম।

এরপর যখন আমার সঙ্গে বিশুদার দেখা হয়, তখন আমার মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। অন্য সব বিষয় আমার আয়ত্তে অঙ্ক ছাড়া। অঙ্কটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না। বাড়ির সবাইও এ বিষয়ে চিন্তিত। স্কুলের মাস্টারমশাইরাও। আমি মনে মনে হাল ছেড়ে দিয়েছি।

সেদিন আমি কোচিং সেন্টার থেকে ফিরছি। পরের দিন অঙ্ক পরীক্ষা। রাস্তার পাশে একটা ল্যাম্প পোস্টের নীচে দেখি বিশুদা দাঁড়িয়ে। আমায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে একগাল হাসল। বিশুদার মাথা ভর্তি এলোমেলো চুল, গাল ভর্তি দাড়ি। আমায় বলল, 'টেনশন হচ্ছে?'

আমি উদাস ভাবে বলি, 'তা তো হচ্ছেই।'

বিশুদা একটা ভাঁজ করা কাগজ দিলেন আমার হাতে। বললেন, 'এই দুটো অঙ্ক চোখ বন্ধ করে মুখস্থ করে পাতায় উগরে দাও।'

তারপর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

আমি বাড়িতে পৌঁছেই অঙ্কগুলো নিয়ে বসলাম। মুখস্থ করতে লাগলাম। কেন জানি না বিশুদার কথাটা অমান্য করার শক্তি পেলাম না। পরের দিন পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখি প্রশ্নপত্রে ওই দুটো অঙ্কই এসেছে। সে বছর আমি চারটে বিষয়ে লেটার পেয়েছিলাম। তার মধ্যে একটা অঙ্ক।

এখন আমি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। আমাদের দুর্বার যৌবন। বামপন্থী রাজনীতি করি। চোখে স্বপ্ন, দুনিয়া বদলে দেব। দেশে কেউ ভুখা থাকবে না। সবাই সমান হবে। মিটিং, মিছিল, পথসভা, কফিহাউসে বসে বারুদ দিয়ে দাঁত মাজা, এসব নিয়েই ছিলাম। একদিন হঠাৎ বাসস্ট্যান্ডে দেখি বিশুদা দাঁড়িয়ে। আমায় দেখে হাসল। আমিও এগিয়ে গেলাম।

'কী খবর? আপনি কেমন আছেন?'

বিশুদা বললেন, 'বেশ আছি। তুমি তো রাজনৈতিক নেতা হতে চলেছ।'

আমি বলি, 'আরে না না। সেরকম কিছু নই। ওই আর কী।'

বিশুদা হাওয়া আড়াল করে একটা সিগারেট ধরালেন। হঠাৎ দেখলাম বিশুদার বাঁ-হাতের দুটো আঙুল নেই। আমি কিছু বলার আগেই বিশুদা বললেন, 'শোনো, তোমার বন্ধুদের মধ্যে ওই সৌমেন ছেলেটার সঙ্গেই বেশি মিশো।'

আমি বললাম, 'কিন্তু, আমার তো সৌমেনকে পছন্দ হয় না।'

বিশুদা শান্ত গলায় বললেন, 'চেষ্টা করো। দেখবে একদিন ও-ই তোমার প্রাণের বন্ধু হবে।' বলেই বিশুদা একটা চলন্ত বাসে উঠে গেলেন।

বিশুদার কথা ফেলতে পারিনি। সৌমেনের সঙ্গে মিশতে শুরু করলাম। সত্যিই একদিন দেখলাম সৌমেন আমার প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠল। সারা দিন এক সঙ্গে থাকা, পাশাপাশি বসে ক্লাস করা, একসঙ্গে বসে পোস্টার লেখা, একই খাবার দুজনে ভাগ করে খাওয়া, মানে ছায়া সঙ্গী হয়ে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশেষে সেই দিনটা এল—বাসভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন। সরকার বাস ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে দ্বিগুণ। সুতরাং তার বিরুদ্ধে আমাদের নামতে হবে পথে।

আমরা মিছিল করে শ্যামবাজার থেকে এগিয়ে চলেছি ধর্মতলার দিকে। আমাদের মজাই লাগছিল। মিছিলের কারণে দাঁড়িয়ে থাকা বাসগুলো থেকে মানুষ আমাদের দেখছে। নিজেদের নেপোলিয়ন মনে হচ্ছিল। বিভিন্ন রাস্তা থেকে মিছিলে আরো মানুষ যোগ দিয়ে মিছিলের শরীর বড় করছিল। একটা সময় মিছিলটা অজগর হয়ে গেল।

'মানছি না, মানব না' স্লোগানে এখন শহরটা বধির হতে চলেছে। এমন সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎই দেখলাম বিশুদা এসে আমার কাঁধে হাত রাখল। তারপর আমার কানে কানে বললেন, 'ঠিক সৌমেনের পেছনে থাকবে। অন্য কোথাও নয়। মনে থাকে যেন ঠিক পেছনে।'

বলেই বিশুদা ভিড়ের মধ্যে উধাও হয়ে গেলেন। আমি হকচকিয়ে গেলেও হাঁটতে শুরু করলাম। সৌমেনের পেছন পেছন।

শ্লোগানের কোলাহলে সবকিছু শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ দেখলাম ধোঁয়া এবং শুরু হল চোখ জ্বালা। টিয়ার গ্যাসে। সামনে থেকে পুলিশ আমাদের দিকে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করেছে। মিছিল ছত্রভঙ্গ হতে না হতেই আবার সঠিক আকার নিয়ে নিল। তারপর গুলির শব্দ। পুলিশ গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে মিছিল লক্ষ করে।

মানুষ দিশেহারা হয়ে দৌড়তে শুরু করল। কেউ কেউ পুলিশের দিকে সোডার বোতল ছুঁড়তে শুরু করল। আমার হঠাৎ-ই বিশুদার কথা মনে পড়ে গেল, 'ঠিক সৌমেনের পেছন থাকবে।'

আমি সৌমেনকে শ্যাডো করতে শুরু করলাম। একটা সময় দেখলাম, সৌমেন রাস্তায় পড়ে গেল। ওর পেটে গুলি লেগেছে। আমি ঠিক ওর পেছনেই ছিলাম। নাহলে গুলিটা আমারই লাগত।

বিশুদার কথা মনে পড়ে গেল, 'দেখবে একদিন ও-ই তোমার প্রাণের বন্ধু হবে।' তাই তো হল। আমার প্রাণ বাঁচল সৌমেনের জন্যই।

সৌমেনের পেটে গুলি লেগে ওর প্যানক্রিয়াসটা ড্যামেজ হয়েছিল। দু-বছর ওকে শয্যাশায়ী থাকতে হবে। বন্ধুহীন হয়ে মনমরা ছিলাম।

একদিন বাকি বন্ধুরা তাল তুলল, 'চল বেড়িয়ে আসি।' বেরিয়ে পড়লাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক'জন মিলে। পৌঁছে গেলাম হিমাচল প্রদেশের অলহর নামে এক গ্রামে। খুব সুন্দর জায়গা। বাতাসে দূষণ নেই। নেই কোলাহল। দু-তিনটে দিন মজায় কাটল।

এই অঞ্চলে একটা বিশাল বাংলোকে ঘিরে একটা গল্প আছে। লোকে বলে বাংলোটা নাকি ভূতুড়ে। প্রায় একশো বছরের পুরোনো এই বাংলো। মিস মরগ্যান নামে এক মহিলা নাকি এটা কিনেছিলেন। তিনি নাকি জাদুবিদ্যা জানতেন। একদিন তিনি আশ্চর্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। তারপর থেকে এই বাংলোতে কেউ থাকেনি। মাঝে মাঝে নাকি ওই বাংলো থেকে অদ্ভুত সব আলো আর শব্দ দেখা ও শোনা যায়।

আমরা বন্ধুরা সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করলাম যে ওইপথ আমরা কেউই মাড়াব না। সবাই সম্মত তো হল, কিন্তু আমার কোথাও একটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। কী আছে ওই বাংলোতে, সেটা না জেনেই চলে যাব?

একদিন কাউকে কিছু না বলেই হাজির হলাম বাংলোটার সামনে। তখন বিকেল। সন্ধ্যা হব হব করছে। সত্যিই বাংলোটা দেখে গা ছমছম করে উঠল। বাংলোটা যেন পুড়ে গেছে। বাংলোটার আশেপাশের ঘাসগুলোও কেমন কালো হয়ে আছে। নুড়ি বিছানো পথ ধরে বাংলোটার সিঁড়িতে যেই উঠেছি এমন সময় দেখি, পেছন থেকে কে যেন ডেকে উঠল। তাকিয়ে দেখি বিশুদা।

মাথায় ঝাঁকড়া এলোমেলো চুল, মুখ ভর্তি দাড়ি। বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খবরদার, তুমি ভেতরে যাবে না। আর দশ মিনিটের মধ্যেই এই বাংলোটা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে পড়ে যাবে। তোমার জন্মের তারিখ, তিথি, নক্ষত্র, ব্লাড গ্রুপ, বোন শেপ, রেটিনার কালার সব ম্যাচ হয়ে যাবে। তুমি পড়বে বিরাট বিপদে। এক্ষুনি চলে যাও।'

আমি সম্মোহিত মানুষের মতো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। বিশুদা আমার হাত ধরে নিয়ে এল আমাদের গেস্ট হাউসের কাছে। সেখানে আমার বাকি বন্ধুরা আছে। তারপর বললেন, 'কালকেই এখান থেকে চলে যাও।'

বলে হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন।...

আমার কলেজ জীবন শেষ হয়ে গেছে। আমি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে। একদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটা মিটিং করছি। এমন সময় দেখি পাশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশুদা। আমার দিকে তাকিয়ে একগাল হাসলেন। একমুখ দাড়ির মধ্যে শুধু দাঁতগুলোই প্রকট হল। এমনিতে আমার দাড়িওলা লোক পছন্দ নয়। কিন্তু বিশুদা তো আলাদা ব্যাপার। বললাম, 'কী ব্যাপার, বহুদিন পর?'

বিশুদা বললেন, 'তুমি এবার থেকে এই বামপন্থী রাজনীতি থেকে সরে এসো। তুমি বরং নাটক করো। নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাও।'

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, বিশুদা হাওয়া।

নাটক যে আমার এত প্রিয় একটা বিষয়, আর আমার মধ্যে যে এত বড় একটা নাট্য প্রতিভা লুকিয়ে আছে সে আমি জানতাম না। যদি না আমি নাট্য জগতে প্রবেশ করতাম। প্রথমে একটা গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে ছিলাম। তারপর নিজেই দু-তিনটে নাটক লিখে ফেললাম। শুরু করলাম নিজের দল। ততদিনে নাট্য কর্মী বা নাট্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমার বেশ নাম হয়ে গেছে।

রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা তখন বেশ সংকটজনক। সরকারি দলের বিরুদ্ধে তখন দানা বাঁধছে অন্য একটি দল। তারা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

বিরোধী রাজনৈতিক দলটা ডাক দিল রাজ্যের বুদ্ধিজীবি সমাজকে ওই রাজ্য সরকারের অনাচারের বিরোধিতা করতে। অনেকে যোগ দিল। যোগ দিলাম আমিও। শুরু হল রাজনৈতিক টানাপোড়েন। হল ভোট। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম ভোটে। বিরোধী পক্ষে। জিতে গেলাম আমরা। গড়লাম নতুন সরকার।

আমি মন্ত্রী হলাম। শিক্ষামন্ত্রী। পার হয়ে গেল পাঁচটা বছর। আবার ভোট। আমি জিতেছি। আমরাও জিতেছি। মানে নতুন রাজ্য সরকার।

পার্টি সুপ্রিমোর কাছে এবার বলে রেখেছি, এবার যেন আমায় পরিবহন দপ্তরটা দেওয়া হয়। কারণ আমার একটা পরিকল্পনা ছিল। আমি বুঝেছিলাম দূষণহীন পৃথিবী বানাতে গেলে তেলের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে। অর্থাৎ তেলহীন যানবাহন প্রয়োজন। সে কারণে আমি একটা বিল আনব। যাতে রাজ্যে ব্যাটারি চালিত যানবাহনের প্রচলন হয়।

আমার প্রস্তাব শুনে উচ্চ পর্যায়ের অনেকে ধন্য ধন্য করলেও আমার কাছে খবর আছে, বহু মানুষ, যাদের জীবিকাই তেল, তারা আতঙ্কিত। তেল মাফিয়ারা আমার প্রাণনাশের চেষ্টা শুরু করেছে। কিন্তু আমি অনড় হয়েই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছি। দেখা যাক না কী হয়!

আমি আমার অফিসে সেদিন বসে আছি। রাত অনেক, তাই লোকজন কেউ নেই। পরেরদিন পরিবহন মন্ত্রী হিসেবে আমার শপথ গ্রহণ। হঠাৎ দেখলাম দরজা ঠেলে বিশুদা ঢুকলেন। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখ ভর্তি দাড়ি। আমার সামনের চেয়ারে বসলেন। বললেন, 'কাল শপথ গ্রহণে তুমি থাকবে না।'

আমি তো অবাক, 'বলেন কি বিশুদা। আমার শপথগ্রহণ আর আমিই যাব না?'

বিশুদা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। বললেন, 'না, তুমি যাবে না। গেলে গুলিবিদ্ধ হবে। তোমায় মারার জন্য তিনজন স্নাইপারকে ভাড়া করা হয়েছে।'

আমি বললাম, 'কারা ভাড়া করেছে?'

বিশুদা একটু হেসে বললেন, 'যাদের বাড়া ভাতে তুমি ছাই দিতে চলেছ। তেল ব্যবসায়ীরা। তুমি বুঝতে পারছ বীরেশ, তোমার ব্যাটারি চালিত যানের তত্ত্ব, মানে তেলহীন যানের তত্ত্ব যদি এই রাজ্যে সফল হয়, তবে গোটা দেশে তার প্রয়োগ হতে কতটা আর সময় লাগবে? তেল ব্যবসায়ীদের কত লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হবে বুঝতে পারছ?'

আমি একটু চিন্তিত হয়ে বললাম, 'তা হলে আমি কাল শপথে না গেলে কি এ সমস্যার সমাধান হবে?'

বিশুদা বললেন, 'হবে। অন্তত হওয়াই তো উচিত। কারণ, তুমি বেঁচে থাকবে, আর বেঁচে থাকলেই তুমি তোমার তত্ত্ব প্রয়োগে সফল হবে।'

আমি বললাম, 'সে না হয় আমি কাল গেলাম না। কিন্তু অন্য কোনো দিনও তো ওরা আমায় মারতে পারে।'

বিশুদা জ্বলন্ত চোখে বললেন, 'না। কালকের পরে আর কেউ ও চেষ্টা করবে না। গোটা পৃথিবীর নজর তোমার ওপর থাকবে।'

আমি বিহ্বল ভাবে বলে উঠি, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বিশুদা...।'

বিশুদা এবার আমার দিকে একটু ঝুঁকে বললেন, 'দেখো। ন'বছর বয়েসে লালাদের বাগানে ঘুড়ি আনতে গিয়ে পাঁচিলের কাচে দুটো আঙুল বাদ পড়ে গেছিল। এই দেখো সেই হাত। তোমার যাতে বাদ না পড়ে তাই তোমায় সতর্ক করেছিলাম। তুমি শুনেছিলে, তোমার আঙুল অক্ষত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধ্যমিকে অঙ্কে কাঁচা ছিলাম। ফেল করেছিলাম। তোমায় অঙ্কগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম। তুমি পাশ করেছ।

আঠেরো বছর বয়েসে পুলিশের গুলি লাগে পেটে। কারণ আমার সৌমেনের মতো বন্ধু ছিল না। তাই সৌমেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে বলেছিলাম। বলেছিলাম ওর পেছনে থাকতে। তাই এই দেখো...,' বলে পাঞ্জাবিটা তুলে দেখান—'এরকম কোনো গুলি বা অপরেশনের কোনো দাগ তোমার পেটে নেই।'

এবার আমার মাথার ভেতর অদ্ভুত সব বিদ্যুৎ খেলে বেড়াতে লাগল, 'তার মানে আপনি আর আমি...।'

বিশুদা আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক ধরেছ। আমি তোমার ভবিষ্যৎ। ঠিক এগারো বছর পরের ভবিষ্যৎ।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আপনি এ অবস্থায় এলেন কী করে?'

বিশুদা একটা করুণ হাসি হেসে বললেন, 'মনে আছে, হিমাচলের মরগ্যান প্যালেস? আসলে ওটা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড। বিশেষ সময় বিশেষ মানুষ ওই ফিল্ডে পৌঁছলে সে টাইম ট্রাভেলের মধ্যে পড়ে যায়। আমি পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমায় দিইনি। তাই তুমি নিরাপদে এখানে বসে আছ।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আপনি কি নিরাপদে নেই?'

বিশুদা একটু হেসে বললেন, 'আমার পায়ের তলায় সর্ষে। আমি এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। অনেক ঝামেলা।'

আমি বললাম, 'তা হলে বার বার আসেন কী করে?'

বিশুদা উদাস মুখে বললেন, 'অনেক কষ্ট করে আসতে হয় বীরেশ। যাতে তুমি বিপদে না পড়ো। মহাকালের লেখাকে বদলানো কি চাট্টিখানি কথা!'

আমি বলি, 'তা হলে আমি তো গুলিবিদ্ধ হব।'

বিশুদা দৃঢ় গলায় বলেন, 'না। তুমি গুলিবিদ্ধ হবে না। তোমার বদলে শপথ নিতে যাব আমি।' এবার বিশুদা নিজের মাথার ঝাঁকড়া চুল ও দাড়িটা খুলে নিলেন।

এবার বিশুদাকে দেখে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। এই জন্যেই ছদ্মবেশে থাকতেন? যাতে আমি চিনতে না পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশুদা হাসলেন, 'তোমার একসেট জামা কাপড় দাও। আরো এক সেট নিজের জন্য রাখো। দুজনেই একইরকম ড্রেসে থাকব। আমি থাকব স্টেজের ওপর, তুমি থাকবে স্টেজের নীচে পাটাতনের তলায়। আমি পাটাতন খুলে রাখব। যখন গুলি চলবে আমি তখন পাটাতনটা পায়ের চাপ দিয়ে স্টেজের নীচে পড়ে যাব। তুমি উঠে আসবে স্টেজের নীচ থেকে। যেন তুমি অকস্মাৎ গুলির শব্দে স্টেজ ভেঙে নীচে পড়ে গেছিলে এবং দেহরক্ষীদের সাহায্যে ভাঙা স্টেজের ভেতর থেকে উঠে এলে।'

এবার আমি বলি, 'কিন্তু বিশুদা, আপনি যখন জানেন গুলিটা কোথা থেকে আসবে তখন এখনই বলে দিচ্ছেন না কেন?'

বিশুদা বললেন, 'যে গুলিটায় তোমার বিদ্ধ হবার কথা সেটা আসবে সামনে থেকে। কিন্তু ভায়া, আরো দুজন স্নাইপার আছে তারা কোথায় লুকিয়ে থাকবে তা তো আমি দেখিনি বা জানি না। সুতরাং গুলি একটা চলাই বাঞ্ছনা। একটা গুলি বাঁচিয়ে দিলে আরো দুটো চলবে অজ্ঞাত জায়গা থেকে। না, তা হতে দেয়া যায় না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু বিশুদা গুলি তো চলবেই।'

বিশুদা বললেন, 'একটা গুলি।'

আমি কঁকিয়ে উঠি, 'সে গুলি তো আপনার লাগবে।'

বিশুদা বললেন, 'সে তো এগারো বছর পরে তোমারও লাগবে। যদি না আবার তোমার বিশুদা আসে।'

আমি বললাম, 'এর মানে বুঝলাম না। এগারো বছর পর কী হবে।'

বিশুদা হেসে বললেন, 'তোমার মৃত্যু যোগ আছে। তবে এগারো বছর তোমার অখণ্ড আয়ু রয়েছে। এটাই কি যথেষ্ট নয়?'

আমার এক সেট জামাকাপড় নিয়ে বিশুদা চলে গেলেন। পরের দিন কাগজে, টিভিতে, শুধু আমারই ছবি। শুধু আমাদের দেশ নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন। তেল ব্যবসায়ীদের ঘৃণিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী মুখর। আমি জাতীয় বীরে পরিণত হলাম। চক্রান্তকারীদের বুলেটেও পরাজিত হলেন না বীরেশ রায়।

আমি শুধু এইটুকুই মনে রাখতে পেরেছি যে আমি ভীরু হয়ে স্টেজের পাটাতনের নীচে বসে আছি। হঠাৎ-ই গুলির শব্দ। পাটাতনের কাঠ সরে গিয়ে বিশুদা পড়লেন আমার সামনে। বুকে একটা লাল দাগ। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাও উঠে পড়ো।' দেহরক্ষীরা হাত ধরে আমায় তুলল। সামনের জনতা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটছে। দেহরক্ষীরা আমায় ঘিরে ধরেছে একটা পাঁচিলের মতো। পাটাতনের নীচে উঁকি দিয়ে বিশুদাকে আর দেখতে পেলাম না।

অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেছে। আমার চুলে পাক ধরেছে। আমি এখন রাজ্যমন্ত্রী নই, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আমার স্বপ্নের ব্যাটারি চালিত যান এখন গোটা দেশ নয়, পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই চলে। আমি এখন আর কাজে তেমন মন দিতে পারি না। কারণ, শপথ গ্রহণের সেই দিনটার পরে কেটে গেছে দশটা বছর। এটা এগারো চলছে। আমি অপেক্ষায় আছি। আজও বিশুদা আসেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~